وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-১০৩)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-৩১৮)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ইতিছাম

الاعتصام

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'এক সময় মুসলিমরা সংখ্যায় অনেক হলেও শক্তিহীন ও প্রভাবহীন হবে। দুনিয়ার প্রেম ও মৃত্যুভীতি তাদের অন্তরে ঢুকে যাবে, আর শত্রুরা একত্র হয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে' (আবূ দাঊদ, হা/৪২৯৭, হাসান)।

● ৯ম বর্ষ ● ৯ম সংখ্যা ● জুলাই ২০২৫

Web : www.al-itisam.com

সম্পাদকীয়

মধ্যপ্রাচ্যে জ্বলছে বারুদ: ইরান-ইসরাঈল উত্তেজনা কি বিশ্বযুদ্ধের দ্বার খুলছে?

MONTHLY AL-ITISAM
Chief Editor : ABDULLAH BIN ABDUR RAZZAK
Published By : AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH
Printed By : Al-Itisam printing press
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM,
Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi-6210
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840
E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلى الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة: ٩، محرم و صفر ١٤٤٧هـ/ يوليو ٢٠٢٥م العدد: ٩، الجزء : ١٠٥
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير : فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرزاق

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য) — হিজরী ১৪৪৭ ॥ ঈসায়ী ২০২৫ ॥ বঙ্গীয় ১৪৩২

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১- জুলাই	০৫ - মুহাররম	মঙ্গলবার	৩.৪৭	৫.১৪	১২.০২	৩.২১	৬.৫০	৮.১৭
০৫- জুলাই	০৯ - মুহাররম	শনিবার	৩.৪৯	৫.১৬	১২.০৩	৩.২২	৬.৫০	৮.১৭
১০- জুলাই	১৪ - মুহাররম	বৃহস্পতিবার	৩.৫২	৫.১৮	১২.০৪	৩.২৪	৬.৫০	৮.১৬
১৫- জুলাই	১৯ - মুহাররম	মঙ্গলবার	৩.৫৫	৫.২০	১২.০৪	৩.২৫	৬.৪৯	৮.১৪
২০- জুলাই	২৪ - মুহাররম	রবিবার	৩.৫৮	৫.২২	১২.০৫	৩.২৭	৬.৪৭	৮.১২
২৫- জুলাই	২৯ - মুহাররম	শুক্রবার	৪.০১	৫.২৪	১২.০৫	৩.২৮	৬.৪৫	৮.০৯
৩০- জুলাই	০৪ - ছফর	বুধবার	৪.০৪	৫.২৭	১২.০৫	৩.২৯	৬.৪৩	৮.০৫

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	০	০	০
নারায়ণগঞ্জ	+১	০	০
নরসিংদী	-১	-১	-১
কিশোরগঞ্জ	-৩	-২	০
টাঙ্গাইল	+১	+১	+৩
ফরিদপুর	+৩	+৩	+২
রাজবাড়ী	+৪	+৪	+৩
মুন্সিগঞ্জ	+১	০	-১
গোপালগঞ্জ	+৫	+৫	+১
মাদারীপুর	+৩	+৩	০
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+২
শরিয়তপুর	+৩	+২	-১

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	-৩	-২	+২
শেরপুর	-২	-১	+৫
জামালপুর	-১	০	+৫
নেত্রকোনা	-৪	-৩	+১

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-১	-২	-৯
খাগড়াছড়ি	-৪	-৫	-৭
রাঙ্গামাটি	-৪	-৫	-৯
বান্দরবান	-২	-৪	-১০
কুমিল্লা	-১	-২	-৩
নোয়াখালী	+১	-১	-৪
লক্ষ্মীপুর	০	০	-১
চাঁদপুর	+১	+১	-২
ফেনী	-১	-২	-৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-২

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৯	-৮	-৩
সুনামগঞ্জ	-৮	-৭	-১
মৌলভীবাজার	-৭	-৭	-৩
হবিগঞ্জ	-৫	-৫	-২

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৬	+৬	+৯
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৬	+৭	+১১
নাটোর	+৪	+৪	+৮
পাবনা	+৪	+৪	+৬
সিরাজগঞ্জ	+১	+২	+৫
বগুড়া	+১	+২	+৭
নওগাঁ	+৩	+৪	+৮
জয়পুরহাট	+২	+৩	+৯

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	-১	০	+১০
দিনাজপুর	+১	+৩	+১২
গাইবান্ধা	-১	০	+৮
কুড়িগ্রাম	-৩	-২	+৮
লালমনিরহাট	-৩	-১	+৯
নীলফামারী	০	+১	+১২
পঞ্চগড়	-১	+১	+১৪
ঠাকুরগাঁও	+১	+২	+১৪

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+৭	+৬	+১
বাগেরহাট	+৭	+৫	০
সাতক্ষীরা	+৯	+৮	+৩
যশোর	+৭	+৭	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৭	+৭	+৬
ঝিনাইদহ	+৬	+৬	+৫
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৬
মেহেরপুর	+৮	+৭	+৮
মাগুরা	+৫	+৩	+৩
নড়াইল	+৬	+৩	+৩

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	+৪	+৩	-২
পটুয়াখালী	+৫	+৪	-৩
পিরোজপুর	+৬	+৫	-১
ঝালকাঠি	+৫	+৪	-২
ভোলা	+৩	+২	-৩
বরগুনা	+৭	+৫	-২

■ সূত্র : মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com) ■ গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Science, Karachi

৯ম বর্ষ
৯ম সংখ্যা

জুলাই ২০২৫
আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪৩২
মুহাররম-ছফর ১৪৪৭

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

উপদেষ্টা
◆ শায়খ আব্দুল খালেক সালাফী
◆ শায়খ মুহাম্মাদ মোস্তফা মাদানী
◆ শায়খ মুহাম্মাদ ইউসুফ মাদানী

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

প্রধান সম্পাদক
আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

সম্পাদক
মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

নির্বাহী সম্পাদক
আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

সহকারী সম্পাদক
হযরত আলী
হাসান আল-বান্না মাদানী
আব্দুল বারী বিন সোলায়মান
মো. আকরাম হোসেন

বিভাগীয় সম্পাদক
◆ মো: নাসির উদ্দিন ◆ আল আমিন
◆ আব্দুল কাদের

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক: আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
সার্কুলেশন ম্যানেজার: মো: নাইমুল ইসলাম

গ্রাফিক্স ও অঙ্গসজ্জা
আসিফ আহমাদ ও আব্দুল্লাহ আল মামুন

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ
০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী
০১৪০৭-০২১৮২২
■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, দিনাজপুর
০১৮৪৩-৩৩৭০৬৮
■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বরিশাল
০১৭২৩-০০৮৪৯১

জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে
বিকাশ পারসোনাল : ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫
বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

ফাতাওয়া হটলাইন : ০১৪০৭-০২১৮৪২
সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা

হাদিয়া ৩০/- (ত্রিশ টাকা) মাত্র

সূচিপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২
◈ দারসে কুরআন
» মুসলিমদের অবক্ষয়ের কারণ ও উত্তরণের পথ (পর্ব-৩) ০৩
-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল
◈ প্রবন্ধ
» ইসলামে মুরদান (দাড়িবিহীন কিশোর-যুবক) সম্পর্কিত বিধিবিধান (পর্ব-৪) ০৭
-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী
» কিতাবুল ইলম: জ্ঞান অর্জনের স্বরূপ (মিন্নাতুল বারী-৫ম পর্ব) ০৯
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক
» আশূরায়ে মুহাররম : গুরুত্ব ও ফযীলত ১২
-আল-ইতিছাম ডেস্ক
» শারঈ দৃষ্টিকোণে পিতামাতার অধিকার ও সদাচরণ ১৪
-মাহবূবুর রহমান মাদানী
» মুমিনের পরিচয় ও তার গুণাবলি (পূর্ব প্রকাশিতের পর) ১৭
-আবূ মাহদী মামুন বিন আব্দুল্লাহ
» মুসলিমদের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ ২০
-মোস্তফা ইউসুফ আলম
» আদ-দাওয়া ইলাল্লাহ: এসো! আল্লাহর পথে... ২২
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক
» জাতির অধঃপতনের পাঁচ সিঁড়ি ২৫
-মাহমুদ হাসান ফাহিম
◈ হারামাইনের মিম্বার থেকে
» আল্লাহর নৈকট্য লাভ ২৬
-অনুবাদ: আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ
◈ তরুণ প্রতিভা
» ইসলামে বৃক্ষ ২৯
-শফিক নোমানী
◈ দিশারী
» আলোর সন্ধানে! ৩০
-মো. কায়সার আলম
◈ নারীদের পাতা
» সম্পত্তিতে নারীর অধিকার ৩২
-রাকিব আলী
◈ হেলথ কর্নার
» অটোইমিউন ডিজিজ ৩৪
-মোছা. রহিমা খাতুন
◈ জামি'আহ পাতা
» আত্মশুদ্ধি: ইসলামী জীবনের অপরিহার্য অংশ ৩৫
-আব্দুল ওয়াদুদ বিন আবূ বকর
◈ গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান
» সবুজ পাখি ৩৭
-মাজহারুল ইসলাম আবির
◈ কবিতা ৪০
◈ সংবাদ ৪১
◈ জামি'আহ ও দাওয়াহ সংবাদ ৪৩
◈ সওয়াল-জওয়াব ৪৪

সার্বিক যোগাযোগ
প্রধান সম্পাদক
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী

সহকারী সম্পাদক: ০১৪০৭-০২১৮৩৮
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক: ০১৪০৭-০২১৮৩৯
সার্কুলেশন ম্যানেজার: ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪০

www.al-itisam.com
youtube.com/c/alitisamtv
facebook.com/alitisam2016
monthlyalitisam@gmail.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

মধ্যপ্রাচ্যে জ্বলছে বারুদ: ইরান-ইসরাঈল উত্তেজনা কি বিশ্বযুদ্ধের দ্বার খুলছে?

ইরান ও ইসরাঈলের দ্বন্দ্ব গত কয়েক দশক ধরে কেবল মৌখিক হুমকি-ধমকির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কখনও-সখনও কিছু টুকটাক হামলা-পাল্টা হামলা হলেও, তা ছিল অভ্যন্তরীণ সমঝোতার ভিত্তিতে পরিচালিত। ফলে অনেকেই ইরান-ইসরাঈল যুদ্ধকে অলীক কল্পনা হিসেবে বিবেচনা করতেন। এমনকি কেউ কেউ তাদেরকে পরস্পরের গোপন মিত্র বলেও মনে করতেন। সেইসব ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে, ১৩ জুন ২০২৫ তারিখে, ইসরাঈলি সময় ভোর সাড়ে ছয়টার দিকে, ইসরাঈল এক ভয়াবহ গোয়েন্দা, ড্রোন ও বিমান হামলার সম্মিলিত অভিযান চালায় ইরানের নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্যবস্তুর ওপর। এই হামলায় ইরানের সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল মুহাম্মাদ বাঘেরি, আইজিআরসি প্রধান মেজর জেনারেল হোসেইন সালামি এবং পদার্থবিজ্ঞানী মুহাম্মাদ মেহদি তেহরাঞ্চিসহ প্রায় এক ডজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা ও পরমাণু বিজ্ঞানী নিহত হন।

ইরানও পাল্টা মিসাইল হামলা শুরু করেছে। তারা তেল আবিব, হাইফাসহ বিভিন্ন শহরের দিকে হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করছে। ইসরাঈলের বেন গুরিয়ন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ইরান যেকোনো সময় হরমুজ প্রণালি বন্ধ ঘোষণা করতে পারে। পারস্য উপসাগর দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সব দেশ থেকে তেলসহ বিভিন্ন পণ্যের আমদানি ও রপ্তানির প্রধান রুট এই প্রণালি। যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে ধারণা করা হচ্ছে, অন্যান্য পরাশক্তিও এতে জড়িয়ে পড়তে পারে, যা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করতে পারে।

বর্তমান পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে আমাদের একটু অতীতে ফিরে যেতে হবে। খামেনি নেতৃত্বাধীন তথাকথিত ইসলামী বিপ্লবের পূর্বে ইরানের শাসনক্ষমতায় ছিল রেজা শাহ পাহলভিরা। তাদের সঙ্গে আমেরিকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং সে কারণে ইরান কখনোই ইসরাঈলের জন্য হুমকি ছিল না। ইরান ও ইসরাঈলের মধ্যে মুখোমুখি শত্রুতা শুরু হয় ইসলামী বিপ্লবের পর থেকে। পারস্যরা যেমন কট্টর শীআ মতবাদের অনুসারী, তেমনি ইসরাঈলি ইয়াহূদীরাও কট্টর ধর্মীয় বিশ্বাসে দৃঢ়। ইসরাঈলের যেমন মধ্যপ্রাচ্যকে ঘিরে সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য রয়েছে, ইরানেরও রয়েছে তেমনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্বপ্ন। ইসরাঈল ও আমেরিকার যেমন নিজস্ব বিশ্বব্যবস্থা (world order) রয়েছে, ইরানও তেমনি নিজস্ব এক বিশ্বব্যবস্থায় বিশ্বাস করে। উভয় দেশের প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক প্রায় নাই বললেই চলে। বিশেষ করে ইরানের শীআ ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে সুন্নী রাষ্ট্রগুলো সবসময় সন্দেহের চোখে দেখে এবং সেই সন্দেহের পেছনে যথেষ্ট যৌক্তিক কারণও রয়েছে।

ইরান বহু সুন্নী দেশে প্রক্সি যুদ্ধের মাধ্যমে ক্ষমতা পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। যেমন ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় সাদ্দাম হোসেনকে দুর্বল করার চেষ্টা চালিয়েছিল। পরবর্তীতে আমেরিকার ইরাক আক্রমণের সময়ও ইরান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমর্থন দিয়েছিল। সিরিয়ায় বাশার আল-আসাদের শীআ শাসন রক্ষায় কাসেম সোলাইমানির নেতৃত্বে বহু সুন্নী মুজাহিদকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। হুথি শীআ বিদ্রোহীদের সঊদী আরবের বিরুদ্ধে উসকিয়ে দিয়ে সঊদীকে বিপদে ফেলা হয়েছে। বাহরাইনে একাধিকবার ক্যু-এর মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা চালিয়েছে। এসব কর্মকাণ্ড ইরানের উচ্চাকাঙ্ক্ষারই প্রমাণ।

অন্যদিকে আমেরিকা ও ইসরাঈলের নিজস্ব বিশ্বব্যবস্থা আছে, যেখানে তাদের আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে এমন কোনো শক্তিকে তারা সহ্য করে না। তাদের কাছে শীআ, সুন্নী, খ্রিষ্টান—এই পরিচয়গুলো গৌণ। অতীতে তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটানোর জন্য পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে মুজাহিদদের অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করেছিল। পরে যখন সেই মুজাহিদরা স্বাধীন হয়ে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে, তখন তাদেরকেও আমেরিকা নিজের বিশ্বব্যবস্থার জন্য হুমকি মনে করে। একইভাবে, রাশিয়াকে ইউক্রেন যুদ্ধে জড়িয়ে রেখে দুর্বল করার চেষ্টা চলছে। একই পরিকল্পনায় ধীরে ধীরে ইরাক, লিবিয়া ও সিরিয়ার মতো দেশগুলোকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তারা এসব অঞ্চল থেকে অবাধে তেল উত্তোলন করছে। কাতার থেকে ইউরোপে গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ করার পরিকল্পনা রয়েছে, যার ফলে ইউরোপের গ্যাস নির্ভরতা রাশিয়ার ওপর থেকে সরে যাবে। যদি এই রুটে তুরস্ক কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে তাকেও একই পরিণতি ভোগ করতে হবে।

চীনের সঙ্গেও আমেরিকার একটি প্রযুক্তিকেন্দ্রিক ঠান্ডা যুদ্ধ চলছে। প্রযুক্তিগত আধিপত্য বজায় রাখতে আমেরিকা সেন্সিটিভ কিছু প্রযুক্তি নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছে। যখনই কোনো দেশ প্রযুক্তিতে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষণ দেখায়, তখন আমেরিকা অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে। এর মধ্যে রয়েছে: পারমাণবিক প্রযুক্তি (Nuclear Technology), উন্নত ক্ষেপণাস্ত্র ও ডিফেন্স প্রযুক্তি (Missile & Defense Systems), AI ও সাইবার-ইন্টেলিজেন্স প্রযুক্তি, Stealth Technology (রাডার এভয়েডিং প্রযুক্তি), জিন প্রকৌশল ও বায়োটেকনোলজি (Advanced Biotech), সেমিকন্ডাক্টর ও চিপ তৈরির মূল প্রযুক্তি, Hypersonic এবং Directed Energy Weapons (Laser & Microwave অস্ত্র) ইত্যাদি।

সম্পাদকীয়-এর বাকি অংশ ৫৬ নং পৃষ্ঠায়

মুসলিমদের অবক্ষয়ের কারণ ও উত্তরণের পথ

-মুহাম্মাদ মুস্তফা কামাল*

(পর্ব-৩)

প্রাক-ইসলামী যুগে আরবরা মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিল এবং এটা তাদের মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। এমনকি এটা তাদের নিত্যদিনের সহজাত প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। তাদের কবিতা, ইতিহাস ও সাহিত্যের একটি বড় অংশ মদের আলোচনায় ভরপুর ছিল। এর নাম ও গুণাবলির ব্যাপক বিবরণ তাদের ভাষায় ছিল। মদে আসক্ত জাতির জীবনে মদের ব্যবহার এত বেশি ব্যাপকতা লাভ করেছিল যে, মদের ক্রয়-বিক্রয় তাদের নিকট ব্যবসার পর্যায়ে পৌঁছেছিল। এর প্রমাণ কুরআন মাজীদে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ‘হে মুমিনগণ! নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তিরসমূহ তো নাপাক শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা পরিহার করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও’ *(আল-মায়েদা, ৫/৯০)*।

আল-কুরআনে মদ বর্জনের আদেশ আসামাত্রই মুসলিমরা মদের পাত্রগুলো চাকু ও ছুরি দিয়ে ভাঙতে শুরু করেন এবং সেগুলোর মধ্যে থাকা মদগুলো মাটিতে ফেলে দেন। এছাড়াও অবশিষ্ট মদের সন্ধানে তারা বিভিন্ন বাড়িতে তল্লাশি চালান, যাতে সেগুলোকেও ফেলে দিতে পারেন। তারা মুহূর্তের মধ্যে কুরআনের আদর্শে উজ্জীবিত এমন একটি জাতিতে পরিণত হয়েছিলেন যে, তারা মদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে দিলেন এবং এর ব্যবহার থেকে নিজেদের জীবনকে সম্পূর্ণ মুক্ত করলেন। এসবই এ কারণে ঘটেছে যে, সে জাতি ছিল তার ইচ্ছায় স্বাধীন, তার আকাঙ্ক্ষার সামনে বাধাহীন, পাশবিক প্রবণতার সামনে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসরমাণ। যখন তাকে এটা বন্ধ করার আহ্বান জানানো হয়, তখন সে তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে একে বন্ধ করতে সচেষ্ট হয়। এককথায় সে স্বাধীনতার সুউচ্চ সুখ উপভোগ করার সুযোগ পেয়েছে, যা তাকে আচরণ নিয়ন্ত্রণের আদেশ দেওয়ামাত্রই সে তা বাস্তবায়নে প্রস্তুত।

আল-কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী মদপান নিষিদ্ধের চর্চায় সফল অভিজ্ঞতার বিপরীতে আমরা দেখতে পাই যে, জাতি, নাগরিকতা ও সংস্কৃতির বিচারে সমৃদ্ধ পশ্চিমা বিশ্ব একই অভিজ্ঞতায় ব্যর্থ হয়েছে। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিংশ শতাব্দীতে তার জনগণকে মদের ক্ষতি থেকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করে। তারা ১৯২০ সালে মদের ব্যবহার নিষিদ্ধ করার জন্য একটি আইন প্রণয়ন করে। এই আইনটি বাস্তবায়নে তারা সিনেমায় প্রচার, নাটকে মঞ্চায়ন, রেডিও, টেলিভিশন এবং বইপত্রে প্রকাশনা ইত্যাদি মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা চালায়। সূক্ষ্ম পরিসংখ্যান আর চিকিৎসাবিজ্ঞানের আলোকে তারা মদের (অ্যালকোহল) ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরে। এই প্রচারণায় তারা ৬৫ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে। মদের ক্ষতিকর দিকের বিবরণ এবং এর ব্যবহার থেকে বিরত রাখতে তারা ৯ হাজার মিলিয়ন পৃষ্ঠার কৃষ্ণপত্র তৈরি করে। এটি কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে অক্টোবর ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ের পরিসংখ্যান প্রমাণ করে যে, এই আইন বাস্তবায়নে করতে গিয়ে ২০০ মিলিয়ন লোককে হত্যা এবং অর্ধ-মিলিয়ন লোককে কারারুদ্ধ করা হয়। এই আইন লঙ্ঘনকারীদের দেড় মিলিয়ন পাউন্ড জরিমানা এবং অমান্যকারীদের ৪০০ মিলিয়ন পাউন্ড অর্থদণ্ড প্রদানের আইন করা হয়। এই আইন বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে মার্কিন সরকার ১৯৩৩ সালের শেষের দিকে মাদক নিষিদ্ধকরণ আইন বাতিল করতে বাধ্য হয়। এটা ছিল একটি ব্যর্থ পরীক্ষা।[১]

এর কারণ এই যে, পাশ্চাত্য সভ্যতাগুলো স্বাধীনতার কথা বললেও তারা তাদের জনগণকে ঐ স্বাধীনতা দিতে পারেনি, যে স্বাধীনতা আল-কুরআন একজন মুসলিমকে দিয়েছে। তা হচ্ছে তার পাশবিক আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে সংগ্রামের স্বাধীনতা এবং তার কামনা নিয়ন্ত্রণের অধিকার। পাশ্চাত্য সভ্যতা মনে করে, স্বাধীনতা হলো তুমি যা ইচ্ছা তাই করো এবং যেভাবে ইচ্ছা ক্ষমতার ব্যবহার করো। এই কারণে তারা আবেগ এবং পাশবিক প্রবৃত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বর্জন করেছে। ফলে পশ্চিমা জনগণ আত্মনিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়ে প্রবৃত্তির শিকারে পরিণত হয়েছে। বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও সভ্যতায় তারা যতই অগ্রগামী হোক না কেন এক্ষেত্রে তারা ব্যর্থ হয়েছে।

* প্রভাষক (আরবী), বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বরিশাল।

১. সৈয়দ আল-হাকীম, উলূমুল কুরআন, পৃ. ৭০।

আল-কুরআন দ্বারা অনুপ্রাণিত নৈতিক মূল্যবোধ ব্যতীত অন্য কোনো কিছুই মানবাত্মাকে প্রভাবিত করতে, দুনিয়ার প্রলোভন পরিত্যাগ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করতে এবং বিভিন্ন প্রকার বাধাবিপত্তি অতিক্রম করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ ‘আর ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয় এটি অসাধ্য কাজ, তবে বিনয়ীদের জন্য কঠিন কিছু নয়’ *(আল-বাক্বারা, ২/৪৫)*। এই সাহায্য প্রার্থনার কাজ অত্যন্ত কঠিন। কেবল নম্র ও বিনয়ীগণই একে যথাযথভাবে সম্পাদন করতে পারে। এই আয়াতে ধৈর্য ও প্রার্থনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ সমস্যার মুখে ধৈর্য ও সততা দৃঢ়তাপূর্ণ অবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে আর ছালাত হচ্ছে মহান আল্লাহর সাথে গভীর ও নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যম। এই ইবাদতের মাধ্যমে মানুষ দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, দৃঢ় বিশ্বাস, প্রবণতা ও কামনা-বাসনা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অর্জন করে।

উল্লেখ্য, আল-কুরআনের আয়াতগুলো কিছু মানুষের ক্ষেত্রে বজ্রের মতো আঘাত করে। সেগুলো তাদের প্রবৃত্তির শিকড় এবং মানুষের মন থেকে পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষার মূলোৎপাটন ঘটায়। আর এই দুনিয়ায় মানুষের জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾

‘আপনি বলুন! তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী ও গোত্র, সম্পদ যেগুলো তোমরা উপার্জন করেছ, তোমাদের ব্যবসা যার মন্দার আশঙ্কা তোমরা কর, আত্মতৃপ্তিদায়ক বাসস্থান যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার চেয়ে উত্তম হয়; তবে তোমরা আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। আর আল্লাহ ফাসেক্ব সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না’ *(আত-তওবা, ৯/২৪)*। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ﴾

‘নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের জীবন, তাদের সম্পদ কিনে নিয়েছেন এই মর্মে যে, তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে। তারা এমন যে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে, ফলে তারা হত্যা করে এবং নিহত হয়। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য অঙ্গীকার, যার বিবরণ তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনে বর্ণিত হয়েছে’ *(আত-তওবা, ৯/১১১)*। আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে ক্রয়ের কথা বলে প্রতিদানের প্রতি আশ্বস্ত করেছেন। কেননা ক্রেতা তাই ক্রয় করে, যার সে মালিক নয়; অথচ আল্লাহ তাআলা সবকিছুর মালিক। এরূপ আয়াত আল-কুরআনে অনেক জায়গায় এসেছে।

আল-কুরআন মানুষকে উচ্চ আধ্যাত্মিক আত্মা উপহার দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ ‘যারা বলে আল্লাহ আমাদের রব, অতঃপর তার উপর অটল থাকে; তখন তাদের উপর আল্লাহর রহমতের ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়ে বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তিত হয়ো না আর জান্নাতের শুভ সংবাদ গ্রহণ করো, যার অঙ্গীকার তোমাদের সাথে করা হয়েছে’ *(ফুছছিলাত, ৪১/৩০)*। এই আয়াতে মানুষের মূল্যায়ন ঈমান এবং সৎ আমল দিয়ে চিত্রায়িত করা হয়েছে। নিশ্চয় মানুষ ঈমানের ছায়াতলে দৃঢ়তার এমন পর্যায়ে পৌঁছতে পারে যে, তার উপর আল্লাহর ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়, তাকে শেখায় এবং শুভ সংবাদ দেয়। মানুষ যখনই আন্তরিক ও আধ্যাত্মিকভাবে আল-কুরআনের ছায়াতলে জীবনযাপন করে, তখন আল-কুরআনের আয়াতগুলোর মর্মার্থ তার সামনে চিত্রায়িত হয় এবং সে প্রাত্যহিক জীবনে দ্রুত পরিবর্তনের পথে অগ্রসর হয়। যেমন আল-কুরআন মানুষের মধ্যে পরিবর্তনের চেতনা সৃষ্টি করে এবং তার কাজকে সঠিক ও উপযুক্ত পথে পরিচালিত করে। যখন কোনো মানুষ এইভাবে জীবনযাপন করে, তখন সে দেখতে পায় যে, তার স্বাধীনতাকে কোনো কিছুই পরাজিত করতে পারে না। কারণ আল-কুরআন প্রতিদিন আমাদেরকে উজ্জ্বল সীমারেখা অঙ্কিত গুরুত্বপূর্ণ পথের সন্ধান দেয়।[২]

আর দুই কল্যাণ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ﴾ ‘আপনি বলুন! তোমরা তো তোমাদের জন্য দুটি কল্যাণের একটি প্রত্যাশা কর আর আমরা তোমাদের জন্য

২. ফাযল ইবনে হাসান আত-তিবরাসী, মাজমাউল বায়ান, ১৫/২৮৮-২৮৯।

প্রত্যাশায় আছি যে, আল্লাহ যেন নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের আযাব দান করেন অথবা আমাদের হাতে শাস্তির ব্যবস্থা করেন। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা করো, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম' *(আত-তওবা, ৯/৫২)*। নিশ্চয় উল্লিখিত বিষয় দুটি মহান নেয়ামতের একটি, যা একজন মুমিন মুনাফেক্বদের জন্য প্রত্যাশা করে এবং এর জন্য অপেক্ষমাণ থাকে আর তা হলো হয় ইহকালে বিজয় এবং গনীমতের সম্পদ লাভ আর না হয় পরকালে স্থায়ী তওবার সাথে চিরন্তন শহীদী জীবন লাভ, যেখানে মুমিনরা আল্লাহর পক্ষ থেকে মুনাফেক্বদের জন্য তাদের হাতে শাস্তি ও ধ্বংস কামনা করে।

উল্লেখ্য, দৃঢ়তা এবং স্থিতিশীলতা ব্যতীত বিপদাপদ ও পরীক্ষায় বিজয় অর্জিত হয়নি। এজন্য আল-কুরআন আমাদেরকে আধ্যাত্মিক শক্তি দান করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ 'নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা, সম্পদের স্বল্পতা, জীবন ও ফসলের ক্ষতি দিয়ে পরীক্ষা করে থাকি। আর আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদেরকে' *(আল-বাক্বারা, ২/১৫৫)*।

তৃতীয় উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্ব গঠন:

ব্যক্তিত্ব গঠন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা মানুষের ব্যক্তিত্বকে স্থায়ী অবকাঠামো প্রদান করে। যাতে তার ব্যক্তিত্ব পরিপূর্ণ মানবিক রঙে রঞ্জিত হয়। যদি এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান না থাকে, তবে সে জীবনে ব্যর্থতার মুখোমুখি হবে। এজন্য মানুষকে তার সত্তা ও ব্যক্তিত্ব গঠনে মনোযোগ দেওয়া উচিত। যদি এমনটি না হয়, তবে সে তার সে অবস্থার উপর অটল থেকে যাবে। সুতরাং ব্যক্তিত্ব গঠনে ধারাবাহিক সাধনা করা প্রত্যেকের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ দৈনন্দিন জীবনে ঘটে যাওয়া অধিকাংশ বিশৃঙ্খলা এবং অপরাধের ক্ষেত্রে আমিত্বকে মানব চরিত্রের সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক আচরণ হিসেবে গণ্য করা হয়। আর এর উৎস হলো নিজেকে বড় মনে করা। সুতরাং আমিত্ব হলো মহান চরিত্রের শত্রু। এই আমিত্বের অহংকার মূলোৎপাটন না করে কোনো মানুষের পক্ষে মহান চরিত্রের অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়।

আমিত্বের মূলোৎপাটন বলতে সকল চারিত্রিক ত্রুটি দূর করা এবং মহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জনে সাধনা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا - وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ 'ঐ ব্যক্তি সফল, যে নিজেকে পবিত্র করেছে। আর ঐ ব্যক্তি ব্যর্থ, যে নিজেকে কলুষিত করেছে' *(আশ-শামস, ৯১/৯-১০)*। অতএব, পবিত্রতা হলো বেড়ে ওঠা এবং মনকে কলুষতা থেকে পবিত্র করা। আর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অর্থটি 'খায়বাতুন' থেকে এসেছে, এর অর্থ হচ্ছে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া। এটা পরিষ্কার যে, মানবিক পরিপূর্ণতা আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সৃষ্টিগত স্বভাব অনুযায়ী প্রদত্ত বৈশিষ্ট্যের আলোকে মানুষের পাপিষ্ঠ হওয়া কিংবা আল্লাহভীরু হওয়ার পার্থক্য করা যায়। অর্থাৎ ইসলাম হলো একটি প্রকৃত জীবনবিধান। অতএব, তাক্বওয়া দিয়ে আত্মার গঠনকে আত্মার পবিত্রতা বলে। পবিত্রভাবে তার বৃদ্ধি এবং তাকে সমৃদ্ধ করা, যা তার স্থায়িত্বকে প্রসারিত করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ 'তোমরা (তাক্বওয়ার) পাথেয় সংগ্রহ করো। কেননা সর্বোত্তম পাথেয় হলো তাক্বওয়া। হে জ্ঞানীগণ! তোমরা আমাকে ভয় করো' *(আল-বাক্বারা, ২/১৯৭)*।

নিশ্চয় দ্বীন ইসলাম এই আত্মম্ভরিতার চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে অবগত। যারা আল্লাহর অস্তিত্ব এবং তাঁর ইবাদত অস্বীকার করে, ইসলাম তাদেরকে অহংকারী বলে আখ্যায়িত করেছে। আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে বলেন, ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ 'তোমরা আমার নিকট প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা অহংকারবশত আমার ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে' *(গাফির, ৪০/৬০)*। এই আয়াতে দু'আ ইবাদত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল-কুরআনের বহু স্থানে এরূপ ব্যবহার দেখা যায়। এর প্রমাণ হলো আল্লাহ তাআলার বাণী, ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا﴾ 'আল্লাহ ব্যতীত তারা যাদের আহ্বান (ইবাদত) করে, তারা নারী ব্যতীত অন্য কেউ নয়' *(আন-নিসা, ৪/১১৭)*। অতএব, দু'আ হলো ইবাদত ও দাসত্বকে স্বীকার করা। আর যে দু'আ বর্জন করে, সে এই কারণে করে যে, যাতে সে ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে অহংকার প্রকাশ করতে পারে।[৩]

অহংকারের আচরণ নিয়ন্ত্রণে ইসলাম নীতিমালা প্রণয়ন করেছে—

(১) নিশ্চয় মানুষের জন্য একজন মাত্র সৃষ্টিকর্তা রয়েছে, যিনি ইবাদতের যোগ্য। মানুষের উচিত তাঁর উপর বিশ্বাস

৩. ইমাম ফখরুদ্দীন আল-রাযী, তাফসীরুল কাবীর, ১৪/৮১-৮২।

রাখা এবং তাঁর ইবাদত করা, যাতে সে সৌভাগ্য লাভ করতে পারে।

(২) পৃথিবীতে ন্যায়পরায়ণতার প্রচার-প্রসার এবং তাঁর আনুগত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ তাআলা মানুষকে প্রতিনিধি হিসেবে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ 'তোমরা ন্যায়পরায়ণতার পথ অবলম্বন করো। কারণ সেটা তাক্বওয়ার অধিক নিকটবর্তী' *(আল-মায়েদা, ৫/৮)*। তিনি ঐ মহান সত্তা, যিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং এই পৃথিবীতে তোমাদেরকে আবাদ করেছেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কি এমন কোনো উপাদান আছে, যার ফলাফল মানব কল্যাণে অবদান রাখতে পারে? বরং পৃথিবীকে আবাদ করার জন্য আল্লাহ তাআলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে এক শ্রেণির মানুষের পেশা নির্ধারণ করেছেন।

আধ্যাত্মিক মূলনীতি এবং ইসলামী চরিত্রের উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যদ্বয়ে বিশ্বাসে সৃষ্ট প্রভাবের দুইটি পর্যায় রয়েছে। প্রথম পর্যায়ের প্রভাব হলো নিজ আভিজাত্য এবং অহংকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা আর দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রভাব হলো উত্তম চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের অনুশীলন করা। একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত নিজ সত্তার প্রশংসা থেকে বিরত থাকা এরূপ পর্যায়ভুক্ত। উক্ত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জীবনযাপন করলে উত্তম চরিত্র অবলম্বন করা মানুষের পক্ষে সম্ভব।

মানুষ যখন ভাবে যে, সে স্বতন্ত্র বা স্বাধীন সত্তার অধিকারী; তখন সে মনে করে তার কাঁধে কোনো দায়িত্ব নেই। সে তখন অবাধ্যতা, সীমালঙ্ঘন এবং আল্লাহর আইন অমান্য করতে শুরু করে। অবাধ্যতা ও স্বেচ্ছাচারিতা তার প্রাত্যহিক জীবনের অভ্যাসে পরিণত হয়। কারণ সে মনে করে তার কর্মকাণ্ড কেউ পর্যবেক্ষণ করছে না। অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার কল্যাণ সম্পর্কে অবগত থাকার পরও সে এসব থেকে বিরত থাকে না। আর যখন কোনো ব্যক্তি মনে করে যে, তার সকল শক্তি, যাবতীয় সম্ভাবনা ও সার্বিক প্রস্তুতি সবকিছু আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে; তখন সে মনে করে, তার নিজস্ব কোনো শক্তি নেই। ফলে তার স্বেচ্ছাচারী হওয়ার সুযোগ থাকে না। এমতাবস্থায় মানুষ মনে করে যে, সে ইলাহী বিধিবিধান বাস্তবায়নে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়েছে।

উল্লেখ্য, মানব ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে পরিচিত মহান ব্যক্তিত্ব থেকে আত্মগঠনের কার্যক্রম চলমান আছে। সম্মানিত রাসূলগণের মাধ্যমে এ কার্যক্রমের সূচনা হয় এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের সাধারণ সদস্য পর্যন্ত এর কার্যক্রম বিস্তৃতি লাভ করে। জাতির নবায়ন এবং তার আধ্যাত্মিক গঠনের এই মূলনীতি যখন উপেক্ষিত হয়, তখন জীবন যুদ্ধের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সক্রিয় ও নিখুঁত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের সংগ্রাম গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে, যা একজন মানুষ জীবনের বিভিন্ন স্তরে সম্মুখীন হয়।

এমন বিশ্বাস করা কি সম্ভব যে, কুরআনুল কারীমের চেয়ে উত্তম এমন কিছু আছে, যে তার আদেশ বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা দিতে পারে? বিষয়টি যদি এমন হয়, তবে মহানবী ﷺ-এর উপর রাতে ছালাত আদায় ওয়াজিব কেন? এর কারণ সূরা আল-মুযযাম্মিলে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে,

﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ - قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا - نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا - أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا - إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا - إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا - إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا﴾

'হে বস্ত্রাবৃত! রাতের কিছু অংশ বাদ দিয়ে দাঁড়ান (ছালাত আদায় করুন) কিংবা অর্ধেক রাত কিংবা তা থেকে কিছুটা কম বা বেশি এবং সুবিন্যস্ত ও স্পষ্টভাবে কুরআন তেলাওয়াত করুন। নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি গুরুত্বপূর্ণ বাণী অবতীর্ণ করেছি। নিশ্চয় ইবাদতের জন্য রাতে উঠা প্রবৃত্তি দমনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল। নিশ্চয় দিবাভাগে রয়েছে আপনার দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা' *(আল-মুযযাম্মিল, ৭৩/১-৭)*।

লক্ষণীয় যে, আয়াতসমূহের প্রেক্ষাপট বৃহৎ ও ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ এবং দায়িত্ব গ্রহণে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর দৃঢ়তা ও প্রস্তুতির প্রতি ইঙ্গিত করে। অর্থাৎ আত্মগঠনের উক্ত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আত্মার বিনির্মাণ ছাড়া এটি সম্ভব নয়। এটা এ অর্থে যে, উল্লিখিত আয়াতে সম্বোধিত ব্যক্তি মহানবী ﷺ। তবে তাঁকে 'হে রাসূল!' বা 'হে নবী!' বলে সম্বোধন করা হয়নি, বরং তাঁকে 'হে বস্ত্রাবৃত!' উপাধি দিয়ে সম্বোধন করা হয়েছে। এ আহ্বান এ নির্দেশনা দান করে যে, এটি সৌন্দর্য অবলম্বন কিংবা বিচ্ছেদের সময় নয়; বরং ঘুরে দাঁড়ানো এবং আত্মগঠনের সময়। রিসালাতের মহান দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত হওয়ার এবং এরূপ কাজের জন্য রাতকে বেছে নেওয়ার সময়।

(ইনশা-আল্লাহ চলবে)

ইসলামে মুরদান (দাড়িবিহীন কিশোর-যুবক) সম্পর্কিত বিধিবিধান

-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী*

(পর্ব-৪)

নারীরা ছোট মেয়েদের দিকে তাকাতে পারবে কিনা?

আমরা লেখাটির শুরুর দিকে দেখে এসেছি, যা কিছু ফেতনা সৃষ্টি করতে পারে বা কামভাবের উদ্রেক ঘটাতে পারে অথবা হারাম বিষয়ে নিমজ্জিত করতে পারে, তার সবকিছুর দিকে দৃষ্টি দিতে মহান আল্লাহ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। এই নিষেধাজ্ঞা পুরুষ-নারী নির্বিশেষে সকলের জন্যই প্রযোজ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾

'মুমিন পুরুষদেরকে বলুন, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয় তারা যা করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত। আর মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে' *(আন-নূর, ২৪/৩০-৩১)*।

ইমাম ত্বাবারী রহিমাহুল্লাহ দ্বিতীয় আয়াতটির তাফসীরে বলেন,

(يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ) عَمَّا يَكْرَهُ اللهُ النَّظَرَ إِلَيْهِ مِمَّا نَهَاكُمْ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهِ.

'নারীরা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে সেসব দিক থেকে, যেসব দিকে তাকানো আল্লাহ অপছন্দ করেন, যেসব দিকে তাকাতে তোমাদেরকেও তিনি নিষেধ করেছেন'।[১]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ বলেন,

لَوْ كَانَ فِي الْمَرْأَةِ فِتْنَةٌ لِلنِّسَاءِ وَفِي الرَّجُلِ فِتْنَةٌ لِلرِّجَالِ لَكَانَ الْأَمْرُ بِالْغَضِّ لِلنَّاظِرِ مِنْ بَصَرِهِ مُتَوَجِّهًا كَمَا يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ الْأَمْرُ بِحِفْظِ فَرْجِهِ.

'যদি কোনো নারীর মধ্যে অন্য নারীদের জন্য ফেতনা থাকে এবং কোনো পুরুষের মধ্যে অন্য পুরুষদের জন্য ফেতনা থাকে, তাহলে দৃষ্টি নত রাখার নির্দেশ সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যে তাকায়; যেমনিভাবে তার গোপনাঙ্গ রক্ষা করার নির্দেশ তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়'।[২]

অতএব, নারী ছোট হোক বা বড় হোক— সেটা বড় বিষয় নয়; বরং বড় বিষয় হচ্ছে, ফেতনা ও কামভাব থাকা বা না থাকার বিষয়টি। কাতারভিত্তিক ফতওয়ার ওয়েবসাইট ইসলামওয়েব-এ এসেছে,

يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ نَظَرِهَا إِلَى عَدَا الْعَوْرَةِ انْتِفَاءُ الشَّهْوَةِ وَأَمْنُ الْفِتْنَةِ، وَهَذَا شَرْطٌ عَامٌّ فِي كُلِّ نَظَرٍ مَهْمَا كَانَتْ صِفَةُ النَّاظِرِ أَوِ الْمَنْظُورِ إِلَيْهِ

'কোনো নারীর 'আওরাত' বা শরী'আতনির্দেশিত অঙ্গের বিশেষ সীমারেখার বাইরে তার দেহের অন্য অঙ্গের দিকে দৃষ্টি দেওয়া বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে, কোনো কামভাব থাকা যাবে না এবং ফেতনামুক্ত থাকার ব্যাপারে নিরাপদ হতে হবে। সব ধরনের দৃষ্টি নিবন্ধের জন্য এটি একটি সাধারণ শর্ত— যে দেখছে, সে যেমনই হোক-না কেন বা যাকে দেখা হচ্ছে, সে যেমনই হোক-না কেন'।[৩]

ফলে উপর্যুক্ত শর্তে পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাতে পারে— যদিও ব্যাপারটিতে মতভেদ রয়েছে।

সম্মানিত পাঠক! পরস্পর দৃষ্টি দেওয়ার বিষয়টি যদি এমন কঠিন হয়, তবে এর চেয়ে ঘনিষ্ট বিষয়গুলোর অবস্থা কী হতে পারে? সেজন্যই তো রাসূল ﷺ বলেছেন, لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ 'কোনো পুরুষ যেন অপর পুরুষের এবং কোনো নারী যেন অপর নারীর 'আওরাত' না দেখে। আর কোনো পুরুষ যেন অপর পুরুষের সাথে এক কাপড়ের নিচে না থাকে। অনুরূপ কোনো নারীও যেন অপর নারীর সাথে এক কাপড়ের নিচে না থাকে'।[৪] তিনি আরো বলেন, لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا 'কোনো নারী অন্য নারীর সাথে শরীর মিলিয়ে শুবে না। কেননা সে তার স্বামীর নিকট অপর নারীর শরীরের বর্ণনা দিবে এবং মনে হবে সে যেন তাকে চাক্ষুস দেখছে'।[৫]

নারীরা পুরুষদের দিকে তাকাতে পারবে কিনা?

ইসলাম পুরুষের মতো নারীদেরকেও যাবতীয় হারাম জিনিস থেকে দৃষ্টি অবনত রাখতে বলেছে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ 'আর মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে' *(আন-নূর, ২৪/৩১)*।

সেকারণে একদল ফক্বীহ পুরুষদের দিকে নারীদের তাকানো হারাম হওয়ার মত ব্যক্ত করেছেন। হাফেয ইবনু কাছীর রহিমাহুল্লাহ উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন, {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} أَيْ: عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ مِنَ النَّظَرِ إِلَى غَيْرِ أَزْوَاجِهِنَّ. وَلِهَذَا ذَهَبَ [كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ] إِلَى أَنَّهُ: لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى الْأَجَانِبِ بِشَهْوَةٍ وَلَا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ أَصْلًا. 'আর আপনি মুমিন নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে। অর্থাৎ তাদের স্বামী ছাড়া অন্য কারো দিকে তাকাবে

---

* বিএ (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এমএ এবং এমফিল, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. তাফসীর ত্বাবারী, ১৯/১৫৫।
২. মাজমূ'উ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ, ১৫/৩৭৪।
৩. ফতওয়াটির লিংক:https://www.islamweb.net/ar/fatwa/19345/
৪. ছহীহ মুসলিম, হা/৩৩৮।
৫. ছহীহ বুখারী, হা/৫২৪০।

www.al-itisam.com

না, যেদিকে তাকানো আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন। আর একারণে অনেক আলেম মন্তব্য করেছেন যে, কোনো নারীর জন্য বেগানা পুরুষদের দিকে তাকানো জায়েয নেই— কামভাব থাক বা না থাক'।[৬]

তবে কামভাব ও ফেতনামুক্ত থাকলে নারীরা পুরুষদের দিকে তাকাতে পারে কিনা, তা নিয়েও মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেছেন, কামভাব ও ফেতনামুক্ত থাকলেও তাকাতে পারবে না। ইবনুল আরাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, وَكَمَا لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الْمَرْأَةِ فَكَذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى الرَّجُلِ، فَإِنَّ عَلَاقَتَهُ بِهَا كَعَلَاقَتِهَا بِهِ، وَقَصْدُهُ مِنْهَا كَقَصْدِهَا مِنْهُ 'একজন পুরুষের জন্য যেমন একজন নারীর দিকে তাকানো বৈধ নয়, তেমনি একজন নারীর জন্যও একজন পুরুষের দিকে তাকানো বৈধ নয়। কারণ নারীর সাথে পুরুষের সম্পর্ক যেমন, পুরুষের সাথে নারীর সম্পর্কও তেমন। নারীর কাছ থেকে পুরুষের চাওয়াপাওয়া যা, পুরুষের কাছ থেকে নারীর চাওয়াপাওয়াও তা'।[৭]

আবার কেউ কেউ বলেছেন, কামভাব ও ফেতনামুক্ত থাকলে তাকাতে পারবে, তবে এদুটির ঝুঁকি থাকলে তাকাতে পারবে না; বরং তখন তাকানো হারাম হবে।

উভয় মতের পক্ষেই শক্তিশালী দলীল আছে। তবে দ্বিতীয় মতটিই বেশি অগ্রাধিকারযোগ্য বলে মনে হয়। শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ছলেহ আল-উছাইমীন বলেন, নারীদের পুরুষদের দিক তাকানোর দুটি অবস্থা হতে পারে:

(১) কামভাব ও মনের স্বাদ গ্রহণসহ তাকানো: ফেতনা-ফাসাদ থাকার কারণে এ প্রকার তাকানো হারাম।

(২) স্বাভাবিক দৃষ্টি, যার সাথে না আছে কোনো কামভাব, না আছে স্বাদ গ্রহণের অভিপ্রায়: উলামায়ে কেরামের বিশুদ্ধ বক্তব্য অনুযায়ী এ প্রকার তাকানো জায়েয। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي المَسْجِدِ 'হাবশীরা মসজিদে খেলাধুলা করা অবস্থায় আমি যখন তাদের দেখছিলাম, তখন খেয়াল করলাম, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাকে আড়াল করে রেখেছেন'।[৮]

অতএব, কামভাব ও ফেতনামুক্ত থাকলে নারী পুরুষের দিকে তাকাতে পারে, কিন্তু পুরুষ নারীর দিকে তাকাতে পারে না। আর কামভাব ও ফেতনা থাকলে নারীর তাকানোও হারাম— টেলিভিশনে হোক বা অন্য কোনো মাধ্যমে হোক।[৯]

উক্ত হাদীছটির ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, وَيَدُلُّ عَلَى جَوَازِ نَظَرِ الْمَرْأَةِ إِلَى الرَّجُلِ 'হাদীছটি নারীর জন্য পুরুষের দিকে তাকানো জায়েয হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে'।[১০]

বুঝা গেল, এখানে কামভাব ও ফেতনার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নারীরাও পুরুষের সৌন্দর্যে বা তার সুন্দর পোশাকে বা তার ব্যবহৃত সুগন্ধির কারণে তার প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে।

কামভাব ও ফেতনার বিষয়টির পাশাপাশি দৃষ্টি কোথায় দিচ্ছে, সেটিও এখানে লক্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য, পুরুষের যেসব অঙ্গ সাধারণত প্রকাশ পায়, নারীরা কামভাব ও ফেতনামুক্ত হলে সেগুলোর দিকে প্রয়োজনে তাকাতে পারে। যেমন- মাথা, চেহারা, হাত, পা ইত্যাদি। কিন্তু পুরুষের আওরাতের দিকে কামভাব ও ফেতনামুক্ত থাক বা না থাক, তাকাতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ 'কোনো পুরুষ যেন অপর পুরুষের এবং কোনো নারী যেন অপর নারীর 'আওরাত' না দেখে। আর কোনো পুরুষ যেন অপর পুরুষের সাথে এক কাপড়ের নিচে না থাকে। অনুরূপ কোনো নারীও যেন অপর নারীর সাথে এক কাপড়ের নিচে না থাকে'।[১১]

ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, فَفِيهِ تَحْرِيمُ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ وَكَذَلِكَ نَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ وَنَبَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ عَلَى نَظَرِهِ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَذَلِكَ بِالتَّحْرِيمِ أَوْلَى 'এ হাদীছে একজন পুরুষের অন্য পুরুষের গোপনাঙ্গের দিকে এবং একজন মহিলার অন্য মহিলার গোপনাঙ্গের দিকে তাকানো হারাম হওয়ার প্রমাণ আছে। আর এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। একইভাবে, কোনো পুরুষের জন্য কোনো মহিলার গোপনাঙ্গের দিকে এবং কোনো মহিলার জন্য কোনো পুরুষের গোপনাঙ্গের দিকে তাকানো ইজমার ভিত্তিতে হারাম। নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) একজন পুরুষকে অন্য পুরুষের গোপনাঙ্গের দিকে তাকানোর ব্যাপারে সতর্ক করার মাধ্যমে একজন পুরুষের জন্য একজন মহিলার গোপনাঙ্গের দিকে তাকানোর ব্যাপারে সাবধান করেছেন। বরং এটা আরো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হারাম'।[১২] উল্লেখ্য, পুরুষের আওরাত হচ্ছে, নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত।[১৩]

সারকথা হচ্ছে, কামভাব ও ফেতনার ঝুঁকি থাকলে পুরুষদের দিকে নারীদের তাকানো যাবে না। অনুরূপভাবে আওরাতের দিকেও তাকানো যাবে না। আর এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই।

(ইনশা-আল্লাহ চলবে

৬. ছহীহ বুখারী, হা/৫২৪০।
৭. ইবনুল আরাবী, আহকামুল কুরআন, ৩/৩৮০।
৮. তাফসীর ইবনে কাছীর, ৬/৪৪।
৯. ফাতাওয়াল মারআতিল মুসলিমাহ, ২/৯৭৩।
১০. ফাতহুল বারী, ১/৫৫০।
১১. ছহীহ মুসলিম, হা/৩৩৮।
১২. আল-মিনহাজ শারহু ছহীহি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ, ৪/৩০।
১৩. মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী, মাওসূ'আতুল ফিক্বহিল ইসলামী, ২/৪২৭।

কিতাবুল ইলম: জ্ঞান অর্জনের স্বরূপ

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(মিন্নাতুল বারী-৫ম পর্ব)

[যে হাদীছের ব্যাখ্যা চলছে:

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ عَارِمُ بْنُ الفَضْلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ ﷺ فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا فَأَدْرَكَنَا - وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلاَةُ - وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا.

***৬০.** ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমাকে আবুন নু'মান আরেম ইবনে ফাযল হাদীছ শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাকে আবূ আওয়ানা হাদীছ শুনিয়েছেন, তিনি আবূ বিশর থেকে, তিনি ইউসুফ ইবনে মাহাক থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে, তিনি বলেন, এক সফরে আমাদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ পিছনে থেকে আসছিলেন। পরে তিনি আমাদের কাছে পৌঁছালেন। তখন ছালাতের সময় হয়ে গিয়েছিল এবং আমরা ওযূ করছিলাম। আমরা (তাড়াহুড়ো করে) আমাদের পায়ে হাত বুলিয়ে নিচ্ছিলাম (ভালোমতো ধুচ্ছিলাম না)। তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে বললেন, 'দুঃখ (বা ধ্বংস) হোক! সেই গোড়ালিগুলো জাহান্নামের আগুনে!' তিনি এটি দুই বা তিনবার বললেন।]*

শব্দ ও বাক্য বিশ্লেষণ:

১. أَرْهَقَتْنَا الصَّلاَةُ

শাব্দিক বিশ্লেষণ:

أرهق - আরবী ক্রিয়া, যার মূল অর্থ হলো বোঝা চাপিয়ে দেওয়া, ঢেকে ফেলা, অতি নিকটে চলে আসা বা পেয়ে বসা।

বাক্যের ব্যাখ্যা:

أَرْهَقَتْنَا الصَّلاَةُ - ছালাত আমাদের ওপর এসে পড়েছিল বা ছালাত আমাদেরকে প্রায় ধরে ফেলেছিল।

এখানে الصلاة শব্দটি ফায়েল (কর্তা)। অর্থাৎ ছালাত নিজেই সময়ের দিক থেকে এতটা কাছে চলে এসেছিল যে, পূর্ববর্তী ছালাত পড়ার সময় সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

হাদীছটির অন্য শব্দ:

হাদীছটি এভাবেও এসেছে- وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلاَةُ অর্থাৎ, আমরা ছালাতকে ধরে ফেলেছিলাম অর্থাৎ আমরা পরবর্তী ছালাতের সময়ের এত কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলাম যে, দেরি করে ফেলছিলাম।

সারকথা: এটি এমন এক অবস্থা বুঝায়, যেখানে দুটি ছালাতের মাঝে সময় এতটাই সংকীর্ণ ছিল যে, একটির সময় আরেকটিকে প্রায় ঢেকে ফেলছিল। মূল বক্তব্য হলো- ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে সময়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্য।

২. وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ

শব্দ বিশ্লেষণ:

ويلٌ - একটি মাছদার (Verbal Noun/ক্রিয়ামূল)। কিন্তু এর জন্য কোনো নির্দিষ্ট ক্রিয়া নেই। এর অর্থ ধ্বংস, দুর্ভোগ, শাস্তি। এটি জাহান্নামের একটি ভয়াবহ উপত্যকার নাম হিসেবেও হাদীছ ও তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। কুরআনে অনেকবার এসেছে, যেমন- فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ অর্থাৎ ধ্বংস তাদের জন্য, যারা ছালাতে গাফেল।

أعقاب - শব্দটি عقب -এর বহুবচন। শব্দটির অর্থ গোড়ালি বা পায়ের পেছনের অংশ। মানুষ যখন স্পোর্টস জুতা পায়ে দেয়, তখন পায়ের পিছনের অংশ ঢাকার জন্য জুতার যতটুকু জায়গা ব্যবহার করা হয়, সেই জায়গাকেই আকিব বলা হয়। তথা গোড়ালিসহ পায়ের গোছার দিকে আরও একটু উপর পর্যন্ত জায়গাকেই আকিব বলা হয়।

বাক্যের অর্থ:

'গোড়ালির জন্য ধ্বংস' অর্থাৎ যারা ওযূর সময় তাদের গোড়ালির অংশ ঠিকমতো ধৌত করে না, তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তির হুমকি রয়েছে।

ফিক্বহী ব্যাখ্যা:

অধ্যায়ের সাথে হাদীছের সম্পর্ক: উক্ত হাদীছে রাসূল ﷺ ছাহাবীদেরকে উঁচু আওয়াজে সতর্ক করেছেন। রাসূল ﷺ -এর উঁচু আওয়াজ প্রমাণ করে যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে উঁচু আওয়াজ ব্যবহার করা যায়। আর এটিই উক্ত হাদীছের সাথে অধ্যায়ের সম্পর্ক।

এটি কোন সফরের ঘটনা?

উক্ত বর্ণনা অনুযায়ী ছাহাবীগণ কোন সফর থেকে ফিরছিলেন, তা সরাসরি উল্লেখ নেই। এই হাদীছেরই ছহীহ মুসলিমের বর্ণনায় স্পষ্ট এসেছে, رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বিএ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ ‘আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে মক্কা থেকে মদীনায় ফিরে আসলাম’।[১] তথা সফরটি বিদায় হজ্জের সফর হতে পারে অথবা মক্কা বিজয়ের সফর অথবা হুদায়বিয়ার সফর হতে পারে। মহান আল্লাহ-ই অধিক অবগত।

বক্তব্যে উঁচু আওয়াজ-ই সুন্নাহ: উক্ত হাদীছ প্রমাণ করে রাসূল ﷺ শিক্ষার জন্য উঁচু আওয়াজ ব্যবহার করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাওয়াতী ও শিক্ষাদান পদ্ধতিতে উঁচু আওয়াজে কথা বলা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। তিনি শুধু কোমল ভাষায় নয়; বরং প্রয়োজন অনুযায়ী উঁচু কণ্ঠে, কখনো রাগ ও সতর্কতার সুরে বক্তব্য দিতেন, যাতে উপস্থিত ব্যক্তিরা গভীরভাবে বিষয়টি উপলব্ধি করেন এবং মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করেন।

এমন পদ্ধতির উদাহরণ ছহীহ হাদীছে বারবার পাওয়া যায়। বিশেষ করে খুৎবা ও জনসম্মুখে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সতর্কবাণী দেওয়ার সময় তিনি কণ্ঠস্বর দৃঢ়, উঁচু এবং গভীরভাবে প্রভাবসঞ্চারী হিসেবে উপস্থাপন করতেন।

হাদীছ: ১

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খুৎবা দিতেন, তখন তাঁর দু’চোখ লাল হয়ে যেত, কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে যেত এবং ক্রোধ তীব্র হয়ে উঠত, এমনকি মনে হতো যেন তিনি কোনো সেনাবাহিনীর আগমন সম্পর্কে সতর্ক করছেন’।[২]

উক্ত বর্ণনা প্রমাণ করে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বক্তব্যে আবেগ, গুরুত্ব ও তাৎপর্য প্রদর্শনের জন্য কণ্ঠস্বর উঁচু করতেন, যাতে শ্রোতারা ভয়, সচেতনতা ও গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে।

হাদীছ: ২

নু‘মান ইবনু বাশীর রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يخطبُ يقول أنذرْتُكم النارَ، أنذرْتُكم النارَ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খুৎবায় বলতে শুনেছি, ‘আমি তোমাদের জাহান্নাম সম্পর্কে সতর্ক করছি, আমি তোমাদের জাহান্নাম সম্পর্কে সতর্ক করছি’। তিনি আরও বলেন, এমনকি যদি কোনো ব্যক্তি বাজারেও থাকতেন, তবুও তিনি এই স্থান থেকে তাঁর আওয়াজ শুনতে পেতেন। আর বক্তব্যের তীব্রতায় তাঁর কাঁধে থাকা চাদর (খামীসাহ) তাঁর পায়ের কাছে পড়ে যায়।[৩]

উক্ত হাদীছ থেকে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনভাবে কথা বলতেন যেন তা দূর থেকেও শোনা যায়। তাঁর আওয়াজে এমন তীব্রতা ও আন্তরিকতা ছিল যে, তা শ্রোতার মনপ্রাণ কাঁপিয়ে দিত।

শিক্ষাদানে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলার হিকমাহ (প্রজ্ঞা):

১. মনোযোগ আকর্ষণ: মানুষ যখন আবেগতাড়িত হয়ে বা দৃঢ় কণ্ঠে কিছু বলে, তখন শ্রোতারা আরও মনোযোগী হয়।

২. ভয়ভীতি সঞ্চার: এমন কিছু বিষয় রয়েছে যেমন- আখেরাত, জাহান্নাম, গুনাহ এসবের আলোচনায় কোমলতার চেয়ে দৃঢ়তা ও সতর্কতার সুর-ই অধিক কার্যকর।

৩. সত্য ও হক্ব প্রকাশ: উঁচু কণ্ঠ হক্ব কথা প্রচারে সাহসিকতার প্রতীক, যা দাওয়াতের মাঠে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পা মাসাহ করতে হবে নাকি ধৌত করতে হবে?

ওযূতে পা মাসাহ করা বা ধৌত করা নিয়ে ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই মতভেদ আছে। মতভেদটি তৈরি হয়েছে কুরআনের একটি আয়াতকে কেন্দ্র করে। কুরআনের আয়াতটি নিম্নরূপ:

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾

‘হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা ছালাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত হাত ধুয়ে নাও এবং তোমাদের মাথা মাসাহ করো ও গোড়ালি পর্যন্ত পা ধৌত করে নাও’ *(আল-মায়েদা, ৫/৬)*।

আলোচ্য আয়াতে পা ধোয়ার বিষয়টি মাথা মাসাহ করার সঙ্গে একত্রে উল্লেখ রয়েছে। এ কারণেই শীআদের মতে, এই আয়াত দ্বারা মাথার মতো পায়ের ওপরও মাসাহ করা প্রমাণিত হয়।

তবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত-এর সকল ইমামের মতে, পা ধোয়া আবশ্যক। এ কারণে তারা আয়াতের وأرجلكم শব্দটিকে আগের وجوهكم (মুখমণ্ডল) এবং أيديكم (হাত) ধোয়ার অংশের সঙ্গে সম্পর্কিত করে পড়েন। এর সমর্থনে তাঁরা أرجلَكم শব্দে لام বর্ণে ‘যবর’ (فتح) দিয়ে পড়াকে গ্রহণ করেন, যা সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ কিরাআত হিসেবে বিবেচিত।

যদি এটি برءوسكم (মাথায় মাসাহ) অংশের সঙ্গে সংযুক্ত হতো, তাহলে আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী ‘لام’ বর্ণে ‘যের’ (كسر) হতো আর এই কারণে যারা পায়ে মাসাহ করার পক্ষে তারা তথা শীআরা أرجلِكم বলে ‘যের’ দিয়ে কিরাআত করেন।

১. ছহীহ মুসলিম, হা/২৪১।
২. ছহীহ মুসলিম, হা/৮৬৭।
৩. ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/৩৬৫৯।

তবে আমাদের আলোচ্য হাদীছটি এই মতবিরোধ নিরসনে যথেষ্ট প্রমাণ। এতে স্পষ্টভাবে পা ধোয়ার কথা বলা হয়েছে, যার কোনো বিকল্প নেই। ফলে আয়াতে যদি পায়ে মাসাহ করার অনুমানযোগ্য ইঙ্গিতও থাকে, তাহলেও এই হাদীছের স্পষ্ট নির্দেশনার ভিত্তিতে সেটিকে 'মানসূখ' (বাতিলকৃত) হিসেবে গণ্য করতে হবে। এটাই ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ-এর মত।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ওযূর পূর্ণ বিবরণে যতগুলো ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, সবগুলোতেই পা ধোয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। আমরা ওযূর অধ্যায়ে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব, ইনশা-আল্লাহ।

এই ঘটনায় ছাহাবীগণ মাসাহ করছিলেন নাকি ধৌত করছিলেন?

যারা আয়াতটি মানসূখ (বাতিলকৃত) বলে মত দিয়েছেন, তাদের মতে, উক্ত ঘটনায় ছাহাবীগণ শুরুতে পায়ের উপর মাসাহ করছিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশনার ফলে তারা পা ধোয়া শুরু করেন। ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ হাদীছে ব্যবহৃত নিম্নোক্ত শব্দ থেকে এই বক্তব্যের প্রমাণ গ্রহণ করেছেন, فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا অর্থাৎ আমরা তখন পায়ে মাসাহ করতে শুরু করলাম।

তবে হাদীছের প্রেক্ষাপটে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শব্দচয়ন এবং ছাহাবীদের বর্ণনার ধরণ সবই প্রমাণ করে যে, তারা আসলে পা ধৌত করছিলেন; কিন্তু ধৌত করাটা ভালোভাবে হচ্ছিল না। কারণ যদি ধরে নেওয়া হয় যে, ঘটনাটি এমন সময়ে ঘটেছিল, যখন ছাহাবীগণ জানতেন না যে, পা ধৌত করতে হয় এবং তারা এটাও বিশ্বাস করতেন যে, পায়ে কেবল মাসাহ করাই যথেষ্ট; তাহলে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই এভাবে কঠোর ভঙ্গিতে, জাহান্নামের হুমকি দিয়ে তাঁদের সতর্ক করতেন না। বরং তিনি প্রথমে শিষ্টাচারপূর্ণভাবে শিখিয়ে দিতেন যে, কীভাবে সঠিকভাবে ওযূ করতে হয়।

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কঠোর সতর্কবাণী এটাই প্রমাণ করে যে, ছাহাবীগণ শুরু থেকেই জানতেন, পা ধৌত করা ফরয; কিন্তু হয়তো সময়ের স্বল্পতার কারণে তাড়াহুড়োয় তারা পা ভালোভাবে ধৌত করছিলেন না, ফলে গোড়ালির অংশ শুকনো থেকে যাচ্ছিল। কারণ গোড়ালি পায়ের পিছনে থাকায় তা সহজে দেখা ও ধৌত করা যায় না।

তবে এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, হাদীছে ব্যবহৃত (نمسح على أرجلنا) 'আমরা পায়ে মাসাহ করছিলাম' এই বাক্যাংশের অর্থ কী হবে?

আসলে 'মাসাহ' শব্দটি মূলত 'হাত বুলানো' বা 'স্পর্শ করা' অর্থে ব্যবহৃত হয়। পা ধোয়ার ক্ষেত্রেও পানি প্রয়োগ করার সময় পায়ে হাত বুলাতে হয়, যাতে পানি সব জায়গায় ভালোভাবে পৌঁছে ওযূ পূর্ণ হয়। অতএব, এই হাদীছে 'মাসাহ' দ্বারা 'পানি ছাড়া মাসাহ' উদ্দেশ্য নয়; বরং এটার অর্থ এই যে, ছাহাবীগণ পানি দিয়ে পা ধোয়ার সময় তাড়াহুড়ো করছিলেন এবং গোড়ালি পর্যন্ত ভালোভাবে কচলিয়ে ধৌত করছিলেন না, হালকাভাবে পানির স্পর্শ করাচ্ছিলেন মাত্র। সেই হালকা স্পর্শ বা অপ্রতুল ধৌত করা বুঝাতেই এখানে 'মাসাহ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

সারমর্ম ও শিক্ষা:

১. ওযূর সময় পা সম্পূর্ণভাবে ধৌত করা জরুরী: ওযূর সময় গোড়ালি বা পায়ের অংশ শুকনো রাখা মারাত্মক গাফলতি, যা জাহান্নামের শাস্তির কারণ হতে পারে।

২. ওযূর ক্ষেত্রে অবহেলা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ: ওযূর সময় ভালোভাবে ধৌত করার প্রতি যত্নবান হওয়া জরুরী। শীতের কারণ, তাড়াহুড়ো বা অন্য কোনো কারণে অবহেলা করা উচিত নয়।

৩. শিক্ষার ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামের উচিত রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মতো দৃঢ় হওয়া: রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো শিক্ষার জন্য জোরে ও সতর্কতামূলক ভঙ্গিতে কথা বলেছেন। আলেমদের জন্য তা অবশ্য অনুসরণীয়।

৪. ধমক দেওয়া ইসলামী শিক্ষার অংশ হতে পারে: যেখানে প্রয়োজন সেখানে কঠোর ভাষা ব্যবহার করা যায়, যদি উদ্দেশ্য সংশোধন হয়।

৫. সফর অবস্থাতেও ছালাতের গুরুত্ব কমে না: ছাহাবীগণ সফরে থেকেও ওযূ করে ছালাতের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, এটি ছালাতের গুরুত্ব প্রমাণ করে।

৬. রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াহর আওয়াজ উঁচু ও শক্তিশালী ছিল: أعلى صوته (উঁচু আওয়াজে বলা) থেকে বোঝা যায়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর কণ্ঠস্বর জোরালো হতো।

৭. ছহীহ সুন্নাহর বিপরীতে আমল করা চলবে না: ছাহাবীগণ যখন ভুলভাবে পায়ে মাসাহ করছিলেন, তখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে তা সংশোধন করেন।

৮. সংশোধনের ক্ষেত্রে দেরি নয়: ইসলাম তাৎক্ষণিকভাবে ভুল সংশোধনের নীতি শিক্ষা দেয়, যাতে তা ভুল অভ্যাসে পরিণত না হয়। প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনবার বলা যায়, যেমনটি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন।

(ইনশা-আল্লাহ চলবে)

আশূরায়ে মুহাররম : গুরুত্ব ও ফযীলত

-আল-ইতিছাম ডেস্ক

আরবী বছরের প্রথম মাস মুহাররম। আরবরা এ মাসকে ‘ছফরুল আউয়াল’ তথা প্রথম ছফর নামকরণ করে নিজেদের ইচ্ছামতো যুদ্ধবিগ্রহসহ বিভিন্ন কাজকে হালাল ও হারাম করত। অবশেষে আল্লাহ তাআলা এ অবস্থাকে নিষিদ্ধ করে এ মাসের ইসলামী নামকরণ করেন ‘শাহরুল্লাহিল মুহাররম’ তথা ‘মুহাররম আল্লাহর মাস’ নামে। এ মাসের ১০ তারিখ আশূরা বলে পরিচিত। নিঃসন্দেহে আশূরার দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদার দিন।

মুহাররম মাসের গুরুত্ব:

মুহাররম মাস হিজরী সনের ১২ মাসের প্রথম মাস, যা হারাম বা পবিত্র মাসগুলোর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বছরের ১২টি মাস সম্পর্কে বলেন,

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ﴾

‘নিশ্চয় আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন হতে আল্লাহর বিধানে আল্লাহর নিকট মাস গণনায় ১২টি মাস, তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস—এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন। সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করো না এবং তোমরা মুশরেকদের সাথে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করো, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করে থাকে। আর জেনে রাখো! আল্লাহ মুত্তাক্বীদের সঙ্গে আছেন’ *(আত-তওবা, ৯/৩৬)*। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, ‘পবিত্র মাস পবিত্র মাসের বিনিময়ে। এতে নিষিদ্ধ জিনিসের জন্য ক্বিছাছ (প্রতিবদলা) এর বিধান রয়েছে’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৯৪)*।

হাদীছে রাসূলুল্লাহ ﷺ ১২টি মাস সম্পর্কে বলেন,

الزَّمَانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو القَعْدَةِ وَذُو الحِجَّةِ وَالمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِيْ بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ.

‘আল্লাহ যেদিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, সেদিন হতে সময় যেভাবে আবর্তিত হচ্ছিল, আজও তা সেভাবে আবর্তিত হচ্ছে। ১২ মাসে এক বছর। এর মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। যুলক্বা‘দাহ, যুলহিজ্জাহ ও মুহাররম। এ তিনটি মাস পরস্পর রয়েছে। আর একটি মাস হলো রজব-ই-মুযার, যা জুমাদা (ছানিয়াহ) ও শা‘বান মাসের মধ্যে অবস্থিত’।[১] ক্বাতাদা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ أَنْفُسَكُمْ এ অংশ থেকে বুঝা যায়, অন্য মাসের চেয়ে এ মাসে যুলুম করা মহাঅপরাধ বা বড় গোনাহর কারণ। যদিও যুলুম সর্বদায় কাবীরা গোনাহ।

আশূরা কী?

‘আশূরা’ শব্দটির বিশ্লেষণ নিয়ে ভাষাবিদগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। অধিকাংশের নিকট মুহাররম মাসের দশম তারিখই আশূরার দিন। এটা আরবী শব্দ (عشر) আশারা হতে নির্গত, যার অর্থ হলো দশ। অতএব, মুহাররম মাসের দশম তারিখে ছিয়াম রাখার নামই হলো আশূরার ছিয়াম।[২]

আশূরার ছিয়ামের প্রেক্ষাপট:

মহান আল্লাহর শুকরিয়াস্বরূপ এই দিনে ছিয়াম রাখা হয়। কারণ, মহান আল্লাহ এই দিনে তাঁর নবী মূসা আলাইহিস সালাম এবং তাঁর ক্বওমকে ফেরাউন ও তার দলবল থেকে রক্ষা করেছিলেন। হাদীছে এসেছে—

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُوْدَ تَصُوْمُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ مَا هَذَا؟ قَالُوْا هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوْسَى قَالَ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوْسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, মহানবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় এসে ইয়াহূদীদের দেখতে পেলেন যে, তারা আশূরার ছিয়াম পালন করছে। তিনি বললেন, এটা কী? তারা বলল, ‘এটা একটা ভালো দিন, এটা এমন একদিন, যেদিন আল্লাহ বানূ ইসরাঈলকে তাদের শত্রুদের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। সুতরাং মূসা আলাইহিস সালাম এই দিন ছিয়াম পালন করেছেন’। তিনি বললেন, ‘আমি তোমাদের চেয়ে মূসা আলাইহিস সালাম-এর ব্যাপারে অধিক হক্বদার’। এরপর তিনি নিজে এই ছিয়াম পালন করেন এবং ছাহাবীদেরকেও ছিয়াম পালনের নির্দেশ দেন।[৩]

মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় এ হাদীছটির বর্ধিত অংশে বলা হয়েছে, আশূরা এমন একটি দিন, যেদিনে নূহ আলাইহিস সালাম-এর কিশতি জুদী পর্বতে অবতরণ করেছিল। ফলে তিনি শুকরিয়াস্বরূপ এ দিনটিতে ছিয়াম রাখেন। অতএব, প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববর্তী নবী ও উম্মতের মাঝেও আশূরায়ে মুহাররমে ছিয়াম রাখার ইবাদত চালু ছিল।

১. ছহীহ বুখারী হা/৩১৯৭।

২. মিরআতুল মাফাতীহ, ৭/৪৫।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/২০০৪।

আশূরার ছিয়ামের হুকুম:

ইসলামের পূর্বযুগ হতেই এ ছিয়ামের প্রচলন ছিল। অতঃপর নবী ﷺ-এর মাধ্যমে তা উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়। রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার পর এটা সকলের ঐকমত্যে সুন্নাত। কিন্তু রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার পূর্বে তার হুকুম সম্পর্কে বিদ্বানগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। কেউ ওয়াজিব বলেছেন, আবার কেউ সুন্নাত বলেছেন। নবী করীম ﷺ নিজে এ ছিয়াম রেখেছেন এবং ছাহাবীদের রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীছে এসেছে—

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ تَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُوْمُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

আয়েশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, কুরায়শরা জাহেলী যুগে আশূরার দিন ছিয়াম পালন করত। এসময় আল্লাহর রাসূল ﷺও এ দিনে ছিয়াম রেখেছেন। অতঃপর তিনি যখন মদীনায় আসেন, তখনও (প্রথমত) তিনি নিজে এ ছিয়াম পালন করেন এবং ছাহাবীদের তা পালন করার হুকুম দেন। তারপর যখন রামাযানের ছিয়াম ফরয হয়, তখন তিনি আশূরার ছিয়াম ছেড়ে দেন। অতঃপর যার ইচ্ছা সে তা রাখত আর যার ইচ্ছা সে তা ছেড়ে দিত।[৪]

আশূরার ছিয়ামের ফযীলত:

আশূরার ছিয়াম বড় ফযীলতপূর্ণ। কেননা হাদীছে এসেছে—

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄ وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَامَ يَوْمًا يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَى الأَيَّامِ إِلاَّ هَذَا الْيَوْمَ وَلاَ شَهْرًا إِلاَّ هَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي رَمَضَانَ.

উবায়দুল্লাহ ইবনে আবূ ইয়াযীদ ﵀ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনু আব্বাস ﵄-কে আশূরার দিনে ছওম পালন করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এ দিন ব্যতীত রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো দিনকে অন্য দিনের তুলনায় উত্তম মনে করে সেদিনে ছওম পালন করেছেন বলে আমার জানা নেই। অনুরূপভাবে রামাযান ব্যতীত রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো মাসকে অন্য মাসের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করে ছওম পালন করেছেন বলেও আমার জানা নেই।[৫]

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেছেন, صِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ ‘আশূরার দিনের ছওমের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আমি আশাবাদী যে, তিনি এর দ্বারা আগের বছরের গুনাহ মোচন করে দিবেন’।[৬]

আশূরার ছিয়ামের সংখ্যা :

এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে—

عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ﵄ يَقُولُ حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আশূরার দিন ছিয়াম পালন করেন এবং লোকদেরকে ছিয়াম পালনের নির্দেশ দেন, তখন ছাহাবীগণ বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! ইয়াহূদ এবং নাছারারারা এ দিনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ইনশা-আল্লাহ আগামী বছর আমরা নবম তারিখেও ছিয়াম পালন করব। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আগামী বছর আসার আগেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যু হয়ে যায়।[৭]

আল্লাহ আমাদের সকলকে সকল ক্ষেত্রে বিশেষ করে আশূরায় মুহাররামে নবী করীম ﷺ-এর সুন্নাত অনুযায়ী ইবাদত করার তাওফীক্ব দিন এবং আশূরাকে কেন্দ্র করে বিদআত, কুসংস্কার ও জাহেলী কর্মকাণ্ড হতে হেফাযত করুন- আমীন!

৪. ছহীহ বুখারী, হা/২০০২।
৫. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৩২।
৬. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬২; মিশকাত, হা/২০৪৪।
৭. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৩৪।

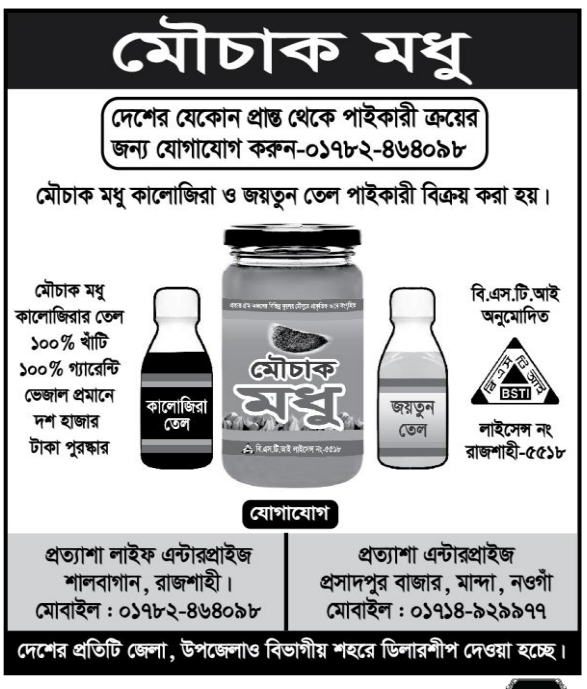

শারঈ দৃষ্টিকোণে পিতামাতার অধিকার ও সদাচরণ

-মাহবূবুর রহমান মাদানী*

ভূমিকা: আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন জায়গায় একমাত্র তাঁর ইবাদত করার নির্দেশ দেওয়ার সাথে সাথে পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে আদেশ দিয়ে তা ফরয করেছেন। যেমনটি আল্লাহ নিজের শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতার সাথে পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞতাকে একত্রিত করে তা অপরিহার্য করেছেন। এমনকি তারা মুশরিক হলেও তারা সদ্ব্যবহার পাওয়ার হক্বদার। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا - وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا - رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا﴾

'আপনার রব হুকুম জারি করেছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না আর পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে। তাদের একজন বা তাদের উভয়ে যদি তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উহ্' শব্দটিও বলবে না আর তাদেরকে ধমক দিবে না। তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলবে। তাদের জন্য নম্রতার বাহু অবনত করবে আর বলবে, হে আমার রব! তাদের প্রতি দয়া করো, যেমনভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালনপালন করেছেন। তোমাদের রব খুব ভালো করেই জানেন তোমাদের অন্তরে কী আছে। তোমরা যদি সৎকর্মশীল হও, তবে নিশ্চয়ই তিনি "তাঁর দিকে বারংবার প্রত্যাবর্তনকারীদের" প্রতি পরম ক্ষমাশীল' *(বানু ইসরাঈল, ১৭/২৩-২৫)*। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো ও তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করো না এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো' *(আন-নিসা, ৪/৩৬)*।

পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা সর্বোত্তম আমল: হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلاَةُ عَلَى مِيقَاتِهَا قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, 'আমি রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে প্রশ্ন করলাম, কোন আমল মহান আল্লাহর নিকট বেশি প্রিয়?' রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'সময়মতো ছালাত আদায় করা'। আমি বললাম, 'তারপর কোন কাজ?' তিনি বলেন, 'পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা'। আমি বললাম, 'তারপর?' তিনি বলেন, 'আল্লাহর পথে জিহাদ করা'।[১]

সদ্ব্যবহার পাওয়ার বেশি হক্বদার: সদ্ব্যবহার পাওয়ার বেশি হক্বদার হলেন, মা। কারণ মাতাই বেশি কষ্ট স্বীকার করেন। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾ 'আমরা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতামাতার প্রতি সদয় আচরণের। তার মা তাকে (পেটে) বহন করেছে কষ্টের সাথে আর তাকে প্রসব করেছে কষ্টের সাথে' *(আল-আহক্বাফ, ৪৬/১৫)*। মহান আল্লাহ আরও বলেন, ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾ 'আমরা মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করেছেন আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। কাজেই আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আমার কাছেই (তোমাদের) প্রত্যাবর্তনস্থল' *(লুক্বমান, ৩১/১৪)*। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদা এক লোক রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমার কাছ থেকে সদ্ব্যবহার পাওয়ার বেশি হক্বদার কে?' তিনি বললেন, 'তোমার মা'। তিনি আবার বললেন, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, 'তোমার মা'। তিনি বললেন, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, 'তোমার মা'। তিনি পুনরায় বললেন, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, 'তোমার বাবা'।[২]

মায়ের খেদমত করা জিহাদ সমতুল্য ছওয়াব: একদা মুআবিয়া ইবনু জাহিমা সুলামী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি জিহাদ করব মনস্থ করেছি, তাই আপনার পরামর্শ নিতে এসেছি'। একথা শুনে তিনি বললেন, 'তোমার মা আছেন কি?' তিনি বললেন, 'জি, হ্যাঁ'। তিনি বললেন, فَالْزَمْهَا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا 'তাহলে তুমি তার খেদমতে অবিচল থাকো। কারণ মায়ের পদতলে তোমার জান্নাত রয়েছে'।[৩]

পিতামাতার খেদমত করা সন্তানের আয়ু বৃদ্ধি ও জান্নাতে প্রবেশের কারণ: আবুদ দারদা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, 'আমি রাসূল

* শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. ছহীহ বুখারী, হা/২৭৮২; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৫।
২. ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৭১; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৪৮।
৩. নাসাঈ, হা/৩১০৪, হাদীছ ছহীহ।

ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, اَلْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ احْفَظْهُ ‘পিতামাতা হলেন জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্যবর্তী দরজা। যদি তুমি চাও, তবে দরজাটিকে নষ্ট করো অথবা সেটাকে হেফাযত করো’।[৪] আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، قِيلَ: مَنْ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ، أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ ‘তার নাক ধূলিধূসরিত হোক, অতঃপর তার নাক ধূলিধূসরিত হোক, অতঃপর তার নাক ধূলিধূসরিত হোক’। বলা হলো, ‘হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সে কে?’ তিনি বললেন, ‘যে ব্যক্তি তার পিতামাতার দুইজনকে অথবা একজনকে বার্ধক্য অবস্থায় পেল, অথচ সে (তাদের খেদমত করে) জান্নাতে যেতে পারল না’।[৫]

পিতামাতার অবাধ্য হওয়া আল্লাহর অসন্তুষ্টির ও জাহান্নামে যাওয়ার কারণ: আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, رِضَى الرَّبِّ فِي رِضَى الوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ ‘পিতামাতার সন্তুষ্টির মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে আর পিতামাতার অসন্তুষ্টির মধ্যে আল্লাহর অসন্তুষ্টি রয়েছে’।[৬] ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ، وَالدَّيُّوثُ، وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى ‘তিন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তাআলা ক্বিয়ামতের দিন তাকিয়ে দেখবেন না— পিতামাতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারিণী মহিলা এবং দাইয়ূস পুরুষ (যে তার স্ত্রী, কন্যা ও বোনের চরিত্রহীনতা ও নোংরামিতে চুপ থাকে এবং বাধা দেয় না)। আর তিন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না— পিতামাতার অবাধ্য সন্তান, মদ্যপ এবং দান করে খোঁটাদানকারী ব্যক্তি’।[৭]

পিতামাতার অবাধ্য হওয়া কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত: রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, عُقُوقُ الوَالِدَيْنِ فِي الْكَبَائِرِ ‘বড় গুরুতর পাপের মধ্যে রয়েছে পিতামাতার অবাধ্য হওয়া’।[৮] নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, كُلُّ ذُنُوبٍ يُؤَخِّرُ اللَّهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا الْبَغْيَ وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ، أَوْ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ، يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهَا فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْمَوْتِ ‘পাপসমূহের মধ্যে কিছু পাপ, যা আল্লাহ ইচ্ছা করেন, সেগুলোর শাস্তি তিনি ক্বিয়ামত পর্যন্ত বিলম্বিত করেন। তবে বিদ্রোহ বা যুলম, পিতামাতার অবাধ্যাচরণ বা রক্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা ব্যতীত। এসব গুনাহের শাস্তি অপরাধীর মৃত্যুর পূর্বেই এই দুনিয়াতে দ্রুত দিয়ে থাকেন’।[৯]

ক্বিয়ামতের অন্যতম মৌলিক আলামত বা নিদর্শন হচ্ছে মানুষ তার পিতামাতাকে ছেড়ে স্ত্রীর কথায় উঠাবসা করবে: আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، وَعَقَّ أُمَّهُ، وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، وَأَقْصَى أَبَاهُ ‘পুরুষ তার স্ত্রীর আনুগত্য করবে এবং মায়ের অবাধ্যতা করবে। আর বন্ধুকে খুব কাছে স্থান দেবে এবং আপন পিতাকে দূরে সরিয়ে রাখবে’।[১০] অর্থাৎ স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে মায়ের অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে যাবে। প্রতিটি মুসলিম পরিবার বর্তমানে এ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। অধিকাংশ সময় মা তার ছোট্ট কুটিরে পড়ে থাকে, ছেলে পাশের রুমে থাকা সত্ত্বেও মাকে একনজর দেখার সময় তার হয় না। অথচ স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে সে মহাফূর্তিতে দিন কাটাচ্ছে। পিতামাতা যদি চুপ থাকেন, তবে সেই অবাধ্যতা দিন দিন চরম আকার ধারণ করে। যার নমুনা আমরা প্রতিদিন পেপার-পত্রিকায় পড়ে থাকি। বন্ধুবান্ধবের সাথে সারাদিন বসে গল্প করবে, তাদেরকে কাছে ডাকবে; কিন্তু পিতার সাথে যে দুয়েকটি কথা বলবে, বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করবে, তার মনে প্রশান্তি দিবে, তার কাছ থেকে দু‘আ নেবে— এ যেন মহা বিরক্তিকর বিষয়। বিশেষত পিতা যদি বয়োবৃদ্ধ হন, তবে তো কোনো কথাই নেই। আল্লাহ যেন সকল সন্তানদেরকে পিতামাতার অবাধ্যতা থেকে রক্ষা করেন- আমীন!

পিতামাতার প্রতিদান: আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ ‘কোনো সন্তান পিতার ঋণ পরিশোধ করতে পারবে না। কিন্তু সে যদি তার পিতাকে ক্রীতদাসরূপে পায় এবং তাকে মুক্ত করে দেয় (তবে সেটা তার প্রতিদান হতে পারে)’।[১১] আবূ বুরদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তিনি ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-এর সাথে ছিলেন। ইয়ামানের এক ব্যক্তি তার মাকে তার পিঠে বহন করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করছিলেন আর বলছিলেন, আমি তার জন্য তার অনুগত উটতুল্য এবং যদি তার বাহন ভয় পায়, তবুও আমি ভয় পাই না। অতঃপর তিনি ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-কে বললেন, আমি কি আমার

৪. তিরমিযী, হা/১৯০০, হাদীছ ছহীহ।
৫. ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৫১।
৬. তিরমিযী, হা/১৮৯৯, হাদীছ ছহীহ।
৭. নাসাঈ, হা/২৫৬২; আহমাদ ৬১৮০।
৮. ছহীহ বুখারী, হা/২৬৫৪; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৯।
৯. আল-আদাবুল মুফরাদ, হা/৫৯১।
১০. তিরমিযী, হা/২২১১; মিশকাত, হা/৫৩৫০।
১১. ছহীহ মুসলিম, হা/১৫১০।

মায়ের প্রতিদান দিতে পেরেছি বলে আপনি মনে করেন? তিনি বললেন, لَا وَلَا بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ ‘না, (কষ্টের সময়ের) তার একটি দীর্ঘশ্বাসের প্রতিদানও হয়নি’।[১২]

কাফের ও মুশরিক পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ‘তোমার (কাফের) পিতামাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না, তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সৎভাবে’ *(লুক্বমান ৩১/১৫)*।

আবূ বকর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর কন্যা আসমা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলাম, قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ ‘আমার জননী আমার কাছে আগমন করেছেন, তিনি আমার প্রতি খুবই অনুরাগী। আমি তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখব?’ তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ, তোমার মায়ের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে’।[১৩]

পিতামাতার মৃত্যুর পরে সন্তানদের কর্তব্য: পিতামাতার মৃত্যুর পর তাদের জন্য দু‘আ করা, ছাদাক্বা করা এবং তাদের বন্ধুদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা সন্তানদের কর্তব্য। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ ‘কোনো লোকের জন্য সবচেয়ে উত্তম নেক কাজ হলো পিতার মৃত্যুর পর তার বন্ধুদের সাথে সদ্ব্যবহার করা’।[১৪] ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) বলেন, সা‘দ বিন উবাদা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর মা যখন ইন্তিকাল করেন, তখন তিনি অনুপস্থিত ছিলেন, পরে তিনি আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বললেন, يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا ‘হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমার অনুপস্থিত থাকাকালে আমার মা মারা গেছেন। এখন যদি তার পক্ষ থেকে কিছু ছাদাক্বা বা দান করি, তাহলে কি তিনি উপকৃত হবেন? নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ‘হ্যাঁ’। সা‘দ বললেন, ‘তাহলে আমি আপনাকে সাক্ষ্য রেখে বলছি যে, আমার মিখরাফের বাগান তার নামে ছাদাক্বা করলাম’।[১৫]

সন্তানরা মুসলিম পিতামাতার জন্য যে দু‘আ করবে:

১. رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ‘হে আমার রব! তাদের প্রতি দয়া করুন, যেমনভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালনপালন করেছেন’ *(বনী ইসরাঈল, ১৭/২৪)*।

২. رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ‘হে আমাদের রব! যেদিন হিসাব অনুষ্ঠিত হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং মুমিনগণকে ক্ষমা করে দিয়েন’ *(ইবরাহীম, ১৪/৪১)*।

৩. رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ‘হে আমার রব! আপনি আমাকে আর আমার পিতামাতাকে যে নেয়ামত দান করেছেন, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার শক্তি দান করুন আর আমাকে এমন সৎকর্ম করার সামর্থ্য দিন যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন; আমার সন্তানদেরকে সৎকর্মপরায়ণ করে দিন। আমি আপনার দিকে ফিরে এসেছি আর নিশ্চয়ই আমি আত্মসমর্পণকারী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত’ *(আল-আহক্বাফ, ৪৬/১৫)*।

৪. আবূ তালেবের কন্যা উম্মু হানী (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-এর মুক্তদাস আবূ মুররা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বর্ণনা করেন যে, তিনি আকীক নামক স্থানে অবস্থিত আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর সাথে তার খামারবাড়িতে একই বাহনে চড়ে গমন করেন। তিনি তার বাড়িতে পৌঁছে উচ্চৈঃস্বরে বলেন, عَلَيْكِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ‘হে আমার মা! আপনার প্রতি আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক’। তার মা বললেন, وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ‘তোমার প্রতিও আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক’। তিনি পুনরায় বললেন, رَحِمَكِ اللَّهُ رَبَّيْتِنِي صَغِيرًا ‘আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন, আপনি আমার শৈশবকালে আমাকে লালনপালন করেছেন’। তার মা বললেন, يَا بُنَيَّ وَأَنْتَ فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا وَرَضِيَ عَنْكَ كَمَا بَرَرْتَنِي كَبِيرًا ‘হে পুত্র! আল্লাহ তোমাকেও উত্তম প্রতিদান দিন এবং তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হোন, যেরূপ আমার বার্ধক্যে তুমি আমার প্রতি সদ্ব্যবহার করেছ’।[১৬]

মুশরিক পিতামাতার জন্য মাগফেরাতের দু‘আ করা নিষেধ। তবে তাদের সুস্বাস্থ্য ও হেদায়েতের জন্য দু‘আ করা যায়। ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এবং মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে তাঁদের পিতামাতার জন্য দু‘আ করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে *(আত-তাওবা, ৯/১১৩)*।

উপসংহার: পরিশেষে আল্লাহর কাছে দু‘আ করি, মহান আল্লাহ আমাদেরকে আমাদের পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

১২. আল-আদাবুল মুফরাদ, হা/১১; শুআবুল ঈমান, হা/৭৫৫০।
১৩. ছহীহ মুসলিম, হা/১০০৩।
১৪. ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৫২; মিশকাত, হা/৪৯১৭।
১৫. ছহীহ বুখারী, হা/২৭৫৬।
১৬. আল-আদাবুল মুফরাদ, হা/১৪।

মুমিনের পরিচয় ও তার গুণাবলি

-আবূ মাহদী মামুন বিন আব্দুল্লাহ*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৭) মুমিনরা তাদের ছালাতসমূহের হেফাযত করে: মুমিনের আরেকটি গুণ হলো তাদের ছালাতসমূহের ব্যাপারে তারা যত্নবান হয়। ঈমান আনার পর সর্বপ্রথম ফরয ইবাদত হলো ছালাত। তাই তো যারা মুমিন, তারা ছালাতের হেফাযতকারী। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ﴾ ‘আর যারা নিজদের ছালাতসমূহ হেফাযত করে’ *(আল-মুমিনূন, ২৩/৯)*। এমনকি ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার প্রথম হিসাব ছালাত সম্পর্কেই নেওয়া হবে। রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার ছালাতের হিসাব নেওয়া হবে। যদি ছালাত সঠিক হয়, তবে সে সফল হবে ও মুক্তি পাবে। আর যদি ছালাত বিনষ্ট হয়, তবে সে অকৃতকার্য ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে’।[১] ‘ছালাতসমূহের হেফাযত করা’ মানে যথাযথভাবে, সঠিক সময়ে নিয়মিত ছালাত আদায় করা *(আন-নিসা, ৪/১০৩)*।[২] ছালাত ছাড়া ক্বিয়ামতের দিন মুক্তি পাওয়ার বিকল্প কোনো পথ নেই। তাই যথাযথভাবে ছালাতের হেফাযত করা মুমিনের একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য; অন্যথা ক্বিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে।

(৮) মুমিনরা জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে: মুমিনের গুরুত্বপূর্ণ একটি গুণ হলো তারা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের জানমাল দিয়ে তাঁরই পথে সংগ্রাম করে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘মুমিন কেবল তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি। আর নিজেদের জানমাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে, এরাই সত্যবাদী’ *(আল-হুজুরাত, ৪৯/১৫)*। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ ‘তোমরা জিহাদ করো মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের জানমাল ও যবান দ্বারা’।[৩] কুরআনের প্রায় সর্বত্র জিহাদের বর্ণনায় আল্লাহ প্রথমে মালের কথা এনেছেন। কারণ জিহাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হলো মাল।

(৯) মুমিনরা প্রিয়নবী ﷺ-কে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে: মুমিনের আরেকটি গুণ হলো তারা দুনিয়ার সকল প্রিয় জিনিসের চেয়ে রাসূল ﷺ-কে বেশি ভালোবাসে, এমনকি নিজেদের জীবনের চেয়েও। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ‘তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তানসন্ততি এবং সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হব’।[৪] এমনকি রাসূল ﷺ-কে ভালোবেসে তাঁর অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করা যায় *(আলে ইমরান, ৩/৩১)*।

(১০) মুমিনরা একে অপরকে বিপদে সাহায্য করে, যুলম করে না: তারা পরস্পরে ভাই ভাই। তারা কাউকে কষ্ট দেয় না, কারও ক্ষতি করে না, কারও প্রতি যুলম-অত্যাচার করে না; বরং তারা পরস্পর পরস্পরকে বিপদ-মুছীবতে সাহায্য করে। রাসূল ﷺ বলেছেন, وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ‘আল্লাহ বান্দার সাহায্যে ততক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে’।[৫] রাসূল ﷺ আরও বলেন, ‘মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার উপর যুলম করে না এবং তাকে (যালিমের হাতে) সোপর্দ করে না। যে কেউ তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে নিয়োজিত থাকবে, আল্লাহ তার অভাব পূরণে নিয়োজিত থাকবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের বিপদ দূর করবে, আল্লাহ তাআলা ক্বিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহ থেকে একটি বিপদ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ গোপন করবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন’।[৬] এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিম ভাইকে সাহায্য করতে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا ‘তোমার ভাইকে সাহায্য করো, সে যালেম হোক অথবা মাযলূম’।[৭] যালেম ভাইকে যুলম থেকে বিরত রাখতে এবং মাযলূম ভাইকে যালেমের হাত থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করতে হবে। কেননা ক্বিয়ামতের দিন যুলম হবে অন্ধকার।[৮] তাই যুলম নামক মারাত্মক ও ভয়াবহ অপরাধ থেকে মুমিনরা বেঁচে থাকে।

(১১) মুমিনরা সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজে নিষেধ করে: সৎ ও কল্যাণকর কাজে আদেশ করা এবং অসৎ ও

---

* অধ্যয়নরত, আক্বীদা ও দাওয়াহ বিভাগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

১. ইবনু মাজাহ, হা/১৪২৫।
২. ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/৩৯৯।
৩. আবূ দাঊদ, হা/২৫০৪, হাদীছ ছহীহ।
৪. ছহীহ বুখারী, হা/১৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৬৯।
৫. ছহীহ মুসলিম, হা/৭০২৮; আবূ দাঊদ, হা/৪৯৪৮।
৬. ছহীহ বুখারী, হা/২২৮০।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/২২৮১।
৮. ছহীহ বুখারী, হা/২২৮৫।

অকল্যাণকর কাজে বাধা দেওয়া মুমিনের একটি অনন্য গুণ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘মুমিন পুরুষ ও নারীগণ পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে। তারা ছালাত ক্বায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এসব লোকদের প্রতি অচিরেই আল্লাহ অনুগ্রহ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়’ *(আত-তাওবা, ৯/৭১)*। এই আয়াতে মুমিন পুরুষ ও নারীর প্রধানতম গুণটি বর্ণনা করা হয়েছে আর তা হলো ‘সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ’। এ কারণেই এই জাতির উদ্ভব হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ﴾ ‘তোমরাই হলে সর্বোত্তম জাতি, তোমাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভালো কাজের আদেশ দিবে, মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে আর আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে’ *(আলে ইমরান, ৩/১১০)*।

(১২) মুমিনরা একে অপরের দুঃখ-কষ্ট দূর করে, দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে: এক মুমিন আরেক মুমিনের জন্য ইমারত তুল্য, যার এক অংশ আরেক অংশকে সুদৃঢ় করে।[৯] তাই তারা কেউ কাউকে দুঃখ-কষ্ট দেয় না আর কারও কাছে দোষ-ত্রুটি বলে বেড়ায় না। রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কোনো মুমিন ব্যক্তির পার্থিব দুঃখ-কষ্টসমূহের মধ্যে একটি কষ্ট দূর করে দেবে, আল্লাহ সেই ব্যক্তি হতে তার ক্বিয়ামতের দুঃখ-কষ্টসমূহ হতে একটি কষ্ট দূরীভূত করবেন। যে ব্যক্তি কোনো নিঃস্ব ঋণগ্রস্তকে অবকাশ দিবে, আল্লাহ তার জন্য ইহকাল ও পরকালে সবকিছু সহজ করে দিবেন। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোনো মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন করবে, আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটিকে দুনিয়া ও আখেরাতে গোপন করবেন। আর আল্লাহ তাঁর বান্দার সহায় থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে’।[১০]

(১৩) মুমিনরা নিজের জন্য যা পছন্দ করে, অপর ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ করে: তারা নিজের জন্য ভালো জিনিস আর অন্যের জন্য খারাপ জিনিস পছন্দ করে না; বরং তারা নিজের জন্য যেটা, অপরের জন্যও সেটা পছন্দ করে। তারা পরস্পরের মাঝে ব্যবধান তৈরি করে না। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ‘তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে’।[১১]

(১৪) মুমিনরা আল্লাহকে ভয় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য করে: তারা শুধু আল্লাহকে ভয় করে। কোনো পীর-ফকির, ওলী-আউলিয়া বা মানুষের আনুগত্য করে না; বরং তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য করে। কেননা আল্লাহ বলেন, ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ‘তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং পরস্পরের মধ্যকার অবস্থা সংশোধন করে নাও। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো’ *(আল-আনফাল, ৮/১)*। আনুগত্য সম্পর্কে অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ ‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো’ *(আন-নিসা, ৪/৫৯)*।

(১৫) আল্লাহর নাম শুনলে মুমিনদের অন্তর ভয়ে কেঁপে উঠে, কুরআনের আয়াত শুনলে ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং মুমিনরা আল্লাহর উপর ভরসা করে: তাদের সামনে যখন আল্লাহর আলোচনা করা হয়, তখন তাদের অন্তর আঁতকে উঠে; তাদের সামনে যখন আল্লাহ তাআলার আয়াত পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করে। কেননা মহান আল্লাহ বলেন, ‘মুমিন তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং যারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে’ *(আল-আনফাল, ৮/২)*।

(১৬) মুমিনদের কাছে প্রতিবেশী মুমিন নিরাপদ থাকে: নিজ প্রতিবেশীকে যেকোনোভাবে কষ্ট দেওয়া কাবীরা গুনাহ। তাই তাদের অনিষ্ট থেকে সর্বদা প্রতিবেশী মুমিন নিরাপদ থাকে। কেননা যে ব্যক্তি নিজ প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়, সে সত্যিকারের মুমিন নয়। রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মুমিন নয়। আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মুমিন নয়। আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মুমিন নয়’। রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! সে ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, ‘যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়’।[১২] প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়ে জান্নাতে যাওয়া যাবে না। রাসূল ﷺ বলেছেন, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ‘সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়’।[১৩] নিজ প্রতিবেশীর প্রতি দয়াশীল হওয়া সত্যিকারের ঈমানের পরিচায়ক।

(১৭) মুমিনদের সকল কাজ ইখলাছে ভরপুর তথা আল্লাহর জন্য হয়ে থাকে: তারা কাউকে ভালোবাসবে শুধু আল্লাহর জন্য এবং কাউকে ঘৃণা করবে তাও শুধু আল্লাহর জন্য।

৯. ছহীহ বুখারী, হা/২২৮৪।
১০. ছহীহ মুসলিম, হা/৭০২৮; আবূ দাঊদ, হা/৪৯৪৮।
১১. ছহীহ বুখারী, হা/১৩; ছহীহ মুসলিম, হা/৪৫।
১২. ছহীহ বুখারী, হা/৬০১৬।
১৩. ছহীহ মুসলিম, হা/৪৬।

কাউকে দান করবে আল্লাহর জন্য এবং দান করা থেকে বিরত থাকবে আল্লাহরই জন্য। অর্থাৎ সকল কাজ হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য, এটা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসল, আল্লাহর জন্য কাউকে ঘৃণা করল, আল্লাহর জন্য কাউকে দান করল এবং আল্লাহর জন্য কাউকে দান করা থেকে বিরত থাকল, সে ব্যক্তি নিজ ঈমানকে পূর্ণতা দান করল'।[১৪] এমনকি আল্লাহর জন্য পরস্পর ভালোবাসা ও শত্রুতা পোষণকারী দুজন ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন আরশের নিচে ছায়া পাবে।[১৫]

(১৮) মুমিনরা উত্তম চরিত্রের অধিকারী হবে: তারা মানুষের সাথে কথা-কাজ, আচার-ব্যবহারে উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করে। তারা কখনো নিন্দনীয় চরিত্রের অধিকারী হয় না। রাসূল ﷺ বলেছেন, أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا 'মুমিনদের মাঝে ঈমানে পরিপূর্ণ সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র সর্বোত্তম'।[১৬] উত্তম চরিত্রের বিষয়টি মহান আল্লাহর প্রতি সঠিক ঈমানের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সুতরাং যে মুসলিম ব্যক্তির হৃদয়ে ঈমান যত ভালো থাকবে, তার চরিত্র ও আচরণ ততই ভালো হবে এবং যে মুসলিম ব্যক্তির হৃদয়ে ঈমান যত খারাপ থাকবে, তার চরিত্র ও আচরণ ততই খারাপ হবে।

(১৯) মুমিনরা নিজেদেরকে সংশোধনের পাশাপাশি অপরকে সংশোধনকারী: তারা কেবল নিজেদের সংশোধনকেই যথেষ্ট মনে করে না, বরং আল্লাহ তাদেরকে যে শক্তি ও সামর্থ্য দিয়েছেন তা পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করে অন্যকেও সংশোধনে সচেষ্ট থাকে। প্রথমে তারা ভালো আচরণের মাধ্যমে সংশোধনের চেষ্টা করে, অন্যথা কঠোরতা অবলম্বন করে। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ 'তোমাদের মধ্যে যে অন্যায় দেখবে, সে যেন তা তার হাত দিয়ে বাধা দেয়। যদি হাত দিয়ে বাধা না দিতে পারে, তবে যেন মুখ দিয়ে বাধা দেয়। আর যদি মুখ দিয়ে বাধা না দিতে পারে, তবে যেন অন্তর দিয়ে বাধা দেয় আর এটি হলো দুর্বল ঈমানের পরিচয়'।[১৭] আল্লাহ বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ 'হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে আর তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো' *(আত-তাহরীম, ৬৬/৬)*। যদি কারও অন্যায় প্রতিরোধের জন্য পর্যাপ্ত শক্তি ও সামর্থ্য থাকে, তাহলে তা ব্যবহার করে অন্যায় থেকে বিরত রেখে সংশোধন করতে হবে আর এটি হলো মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(২০) মুমিনরা সকল বিপদে ধৈর্যধারণ করে: মুমিনের অন্যতম গুণ হলো তারা অনেক ধৈর্যশীল। এই দুনিয়া মুমিনদের সুখ ও শান্তির জায়গা নয়, তাদের চিরস্থায়ী শান্তির জায়গা জান্নাত। সেজন্য তাদেরকে এই পৃথিবীতে বিভিন্ন দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদে ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়। রাসূল ﷺ বলেছেন, الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ 'দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা এবং কাফেরের জন্য জান্নাত'।[১৮]

শুধু প্রকৃত মুমিনরাই এই ধৈর্য নামক পরীক্ষায় মহান আল্লাহর কাছে উত্তীর্ণ হয়। ধৈর্য তিন ধরনের হয়। যথা— (ক) ইবাদত বা আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্যধারণ, (খ) আল্লাহর অবাধ্যতা বা পাপাচার থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ এবং (গ) বিপদাপদের সময় ধৈর্যধারণ। ধৈর্যধারণের মাধ্যমে মুমিনরা আল্লাহর সাহায্য লাভ করে। আল্লাহ বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ 'হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো' *(আল-বাক্বারা, ২/১৫৩)*।

এগুলো ছাড়াও মুমিনের আরও অনেক গুণাবলি রয়েছে, যা মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ কুরআনুল কারীম ও হাদীছের বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করেছেন।

আপনি মুমিন কি-না, এটা বুঝবেন কীভাবে?

যদি কোনো নেক (সৎ) কাজ আপনাকে আনন্দ দেয় এবং খারাপ (অসৎ) কাজ পীড়া দেয়, তখন বুঝবেন আপনি মুমিন। রাসূল ﷺ-কে ঈমান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছেন, إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ 'যখন তোমাকে নেক (সৎ) কাজ আনন্দ দিবে ও খারাপ (অসৎ) কাজ পীড়া দিবে, তখন তুমি মুমিন'।[১৯]

উপসংহার:

প্রকৃতপক্ষে মুমিনরাই সফলকাম। মুমিন ছাড়া পরকালে কেউ মুক্তি পাবে না। দুনিয়াতে শান্তি ও পরকালে মুক্তি পেতে মুমিন হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। তাই পরিপূর্ণ মুমিন হতে হলে উপরিউক্ত গুণাবলি প্রত্যেক মুমিন দাবিদার ব্যক্তির মাঝে থাকা জরুরী। মহান আল্লাহ উক্ত গুণাবলি নিজেদের মাঝে ধারণ করার তাওফীক্ব দান করুন এবং মুমিন হিসেবে আমাদের মৃত্যু দান করুন- আমীন!

---

১৪. আবূ দাঊদ, হা/৪৬৮১; ছহীহুল জামে', হা/৫৯৬৫।
১৫. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪২১; ছহীহ মুসলিম, হা/২৪২৭।
১৬. আবূ দাঊদ, হা/৪৬৮২, হাসান ছহীহ।
১৭. ছহীহ মুসলিম, হা/৪৯।
১৮. ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৫৬; মিশকাত, হা/৫১৫৮।
১৯. সিলসিলা ছহীহা, হা/৫৫০; মিশকাত, হা/৪৫; আহমাদ, হা/২১৬৬২; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/১৭৩৯।

মুসলিমদের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ

-মোস্তফা ইউসুফ আলম*

আজকের বিশ্ব অগণিত সমস্যায় জর্জরিত। বিশ্ব মানব আজ শান্তির সন্ধানে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জড়বাদী সভ্যতার ঝলসানো মরীচিকার পেছনে উন্মাদের মতো ছুটে চলেছে। শান্তির জন্য একের পর এক মানবসৃষ্ট মতবাদের বাস্তবতারও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। কিন্তু মানবজীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠায় মানুষের মনগড়া সকল মতাদর্শ চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। মানবজাতি আজ মুক্তি, কল্যাণ, শান্তি, উন্নতি, অগ্রগতি ও প্রগতির নামে আজ দুঃখ-দুর্দশা, অনাচার, অত্যাচার-নিপীড়ন, হতাশা ও বঞ্চনার সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে। মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশে মানবজীবনকে দুঃখ-দুর্দশা, বর্বরতা, অসভ্যতা ও যুলম-নির্যাতন তথা নিষ্পেষণের জাঁতাকল হতে মুক্তি প্রদানে একদিন একমাত্র ইসলামের অবদান গোটা জাতিকে বিস্মিত ও বিমোহিত করেছিল।

ইসলামের স্বর্ণযুগের ইতিহাস ভাবাবেগকে কেন্দ্র গড়ে ওঠেনি; বরং তা ঐতিহাসিক সত্যের রুদ্রালোকে সুস্পষ্ট, স্বচ্ছ ও সমুজ্জ্বল যে, শুধু ইসলামী মূল্যবোধই মানবজীবনে কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় সাফল্য অর্জন করেছে, যা বিশ্বের ঐতিহাসিকগণ নির্দ্বিধায় স্বীকৃতি প্রদান করেছেন।

তাওহীদের হে চির সেবক বীর মুসলিম! আমি এখন মুসলিমদের অতীতের গৌরবোজ্জ্বল স্বর্ণালি ইতিহাস, বর্তমান দিশেহারা নির্যাতিত মুসলিম জাতির দুরবস্থার কারণ ও ভবিষ্যতে ধ্বংসোন্মুখ মহাদুর্গতির চরম দুর্ভাবনাকে সামনে রেখে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছি।

প্রথমেই আসুন আমরা বিশ্ব মুসলিমের অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস জেনে নিই।

ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, শিক্ষায়, সভ্যতায়, ইবাদতে, রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, কাব্যে, সাহিত্যে, শিল্পে, বাণিজ্যে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, ধর্মে-কর্মে, ত্যাগে-তিতিক্ষায়, মহানুভবতায়, পরোপকারিতায়, শৌর্যে-বীর্যে ও চরিত্রে মাধুর্যে মুসলিম জাতিই দুনিয়ায় শীর্ষ স্থান অধিকার করেছিলেন। প্রিয় নবী ﷺ-এর পর মাত্র এক শতাব্দীর মধ্যে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যে তারা ইসলামের সুমহান আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। মদীনা, কূফা, বাছরা, দামেশক, বাগদাদ, কর্ডোভা, সেভিল, গ্রানাডা, সমরখন্দ ও ইস্পাহান শহরগুলোকে ব্যবসা-বাণিজ্যে, পার্থিব সম্পদ, শিক্ষা, সভ্যতা, তাহযীব ও তামাদ্দুনের কেন্দ্রস্থলে পরিণত করেছিলেন তারা।

সোনালি অতীত, সুবিখ্যাত মুসলিম পণ্ডিত আলকিন্দি দর্শনশাস্ত্রের গোড়াপত্তন করেছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনে যাকারিয়া একজন শ্রেষ্ঠ রসায়নশাস্ত্র বিশারদ ছিলেন। তিনি হীরাকসকে শোধন করে গন্ধকদ্রাবক তুঁতিয়া প্রস্তুত করেছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে সারা জগতকে আবুল কাশেম আল-জাহরবী তার আশ্চর্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। তিনি একজন শ্রেষ্ঠতম অস্ত্র চিকিৎসা বিশারদ ছিলেন। জাবের ইবনে হাইয়ানই রসায়নশাস্ত্রের জন্মদাতা। শুধু জাবের ইবনে হাইয়ানই নন; আল-ফারাবী, ইবনে সিনা, আল-বিরুনী, আল-গাযালী, ইবনে বাজা ও ইবনে রুশদের মতো দর্শন, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও প্রকৃতিবিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ সাধনকারী মুসলিম মনীষীগণ পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ। মুসলিম মনীষী মূসা আল-খারেযমী সৌরমণ্ডল জ্যোতির্মণ্ডল সম্বন্ধে গবেষণা করে পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। শুধু তাই নয়, বীজগণিতের ভিত্তি রচনা করেছিলেন তিনিই। তার আল-জাবর নামক বীজগণিতের মৌলিক গ্রন্থ হতে ইউরোপীয় অ্যালজেবরা শব্দটি চয়ন করা হয়েছে। এছাড়া আল-বাত্তানী, আল-ফারগানী, আল-বিরুনী, উমার খৈয়াম ও নাছিরুদ্দীন তুসীর মতো মুসলিম মনীষীগণ জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতশাস্ত্রে মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারকে বহুগুণে সমৃদ্ধ করে গেছেন। সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসশাস্ত্রে মুসলিমদের কাছে দুনিয়াবাসী ঋণী। বিখ্যাত মুসলিম মনীষী ইবনে খালদুন সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসশাস্ত্রের আবিষ্কারক ছিলেন। কেবল ইবনে খালদুনই নন; বালাজুরির মতো, হামাদানীর মতো, আল-বিরুনীর মতো, আল-তাবারীর মতো, আল-মাসঊদীর মতো, ইবনে হাযমের মতো, ইবনুল আছীরের মতো, ইবনে খল্লিকানের মতো, শাহ ওয়ালিউল্লাহর মতো শত শত মুসলিম ঐতিহাসিকদের অবদানে মানব ইতিহাস সমৃদ্ধ ও উন্নত হয়েছে। মুসলিম বৈজ্ঞানিক আবুল হাসান সর্বপ্রথম দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। আবুল হাসান ও আলী ইবনে আমাজুর সর্বপ্রথম চন্দ্র সম্বন্ধে গবেষণায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। কায়রোতে ইবনে ইউনুস নামে এক মহা মনীষী সর্বপ্রথম পেন্ডুলাম আবিষ্কার করে তার দোলনের সাহায্যে সময় নিরূপণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। মুসলিমরাই স্থাপত্য শিল্পে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন। আগ্রার তাজমহল, জেরুযালেমের উমারের মসজিদ, কনস্টান্টিনোপল বা ইস্তাম্বুলের সেন্টসফিয়া মসজিদ, কর্ডোভার মসজিদ, স্পেনের আল-হামরা, দিল্লির দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাছ, মতি মসজিদ যার বাস্তব প্রমাণ।

পানিপথের প্রথম যুদ্ধে কামান ব্যবহার করে মুসলিমরাই দুনিয়াবাসীকে কামান ও বারুদের ব্যবহার শিখিয়েছেন। গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড তৈরি করে এ জাতিই রাস্তা নির্মাণের আদর্শ দেখিয়েছে। ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করে এ জাতিই ডাক বিভাগের সূত্রপাত করেছেন। আমরা যাকে চীনের

* কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা।

প্রাচীন সভ্যতা বলে দেখতে পাই, আসলে তা মুসলিমদের জ্ঞানালোক বর্তিকা থেকে ধার করা স্ফুলিঙ্গ ছাড়া আর কিছুই না। সার্বিক উন্নতির অগ্রযাত্রায় বিশ্ববাসী যে মুসলিমদের কাছে ঋণী, তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

যে জাতি মাত্র কয়েকটা বছরের এক অখণ্ড আদর্শ রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপনে সক্ষম হয়েছিলেন। যে জাতির আদর্শ, শিক্ষা ও সভ্যতার জ্যোতি আরব ভূমি হতে বিকিরণ হয়ে সারা দুনিয়াকে উদ্ভাসিত করেছিল। সেই জাতি আজ চরম অধঃপতিত, নিগৃহীত। ভাবতেই অশ্রুবানে দুচোখ ভেসে যায়।

আয়নার পারদ আয়না থেকে ঝরে গেলে আয়নার যে দুরবস্থা হয়, বর্তমানে মুসলিমদের ঠিক সেই অবস্থাই হয়েছে। এর কারণ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দিতে গিয়ে শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কবি সম্রাট আল্লামা ইকবাল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এই দুরবস্থার কারণ ইসলাম নয় বরং ইসলামী আদর্শ থেকে বিচ্যুতি।

তিনি এর দুর্ভোগের কারণ আরও পরিষ্কার করে বলেছেন নিম্নোক্ত ভাষায়—

উহ যামানা মে মুয়াযযায থে
মুসলমা হো কার
আজ তুম যালিল ও খার হু-য়ে
তারেকে কুরআ হো কর।

অর্থাৎ সে যুগের মুসলিম ছিল অতি মহান, আজ তারা লাঞ্ছিত হয়েছে ছাড়িয়া কুরআন।

বাস্তবেও তাই আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। ১৮৭০ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড গ্লার্ডস্টোন সংসদ অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষণে কুরআন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে নিজ হাতে কুরআন মাজীদ উঁচু করে বলেছিলেন, 'এই পুস্তকের বদৌলতে আরবের বেদুঈনরা পারস্য ও রোমের মতো শক্তিশালী সাম্রাজ্য বিজয় করেছিল। তাই যতদিন পর্যন্ত এই পুস্তক মুসলিমদের কাছে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত আমরা তাদের হুমকির ভয়াবহতা থেকে নিরাপদ হতে পারব না'।

এই বিষোদগার করে শ্লেষ্মাভরে কুরআন মাজীদকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। -নাঊযুবিল্লাহ-

আজ মুসলিমদের প্রত্যেক ঘরেই আক্ষরিক অর্থে কুরআনের পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান। কিন্তু বাস্তব জীবনে এর প্রতিফলন না থাকায় আমাদের এহেন দুরবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

আমাদের জাতীয় জীবনে কুরআনের অলঙ্ঘনীয় বাণীকে উপেক্ষা করে দুনিয়ার চির অভিশপ্ত ইয়াহূদী, নাছারাদের কৃষ্টি-কালচার, শিক্ষা-সংস্কৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, চালচলন, সভ্যতা, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি বরণ করে নিয়েছি। মানবতার সুমহান প্রতীক বিশ্বনবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুমহান আদর্শকে পরিত্যাগ করে মার্কস, লেনিন, হেগ, ডারউইনের মতাদর্শ গ্রহণ করেছি। এ অবস্থা উল্লেখ করতে গিয়ে কবি সম্রাট আল্লামা ইকবাল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আজকের মুসলিম পোশাক-পরিচ্ছদে খ্রিষ্টান ও শিক্ষা-সংস্কৃতিতে হিন্দু। আমাদের প্রতি লক্ষ্য করে আক্ষেপ ছলে তিনি আরও বলেন, আজকের মুসলিমদের দিকে তাকালে ইয়াহূদী-নাছারারাও লজ্জায় মুখ ঢাকবে। জাতীয় জীবনে এহেন সমস্যা সমাধানকল্পে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং বিভক্ত হয়ো না' *(আলে ইমরান, ৩/১০৩)*।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিদায় হজ্জের অমীয় বাণীতে তাই-ই প্রমাণ করে; তিনি বলেন, 'তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত বিভ্রান্ত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর কিতাব (কুরআন) ও আমার সুন্নাতকে ধারণ করে রাখবে'। সর্বোপরি এটাই প্রমাণিত হয় যে, আমাদের জীবনে দুঃখ-দুর্দশা, অশান্তি, অরাজকতা, নির্যাতন, নিষ্পেষণ, যুলম, অন্যায়, অবিচার সবকিছুর মূল কারণ কুরআনকে আমাদের জীবন পথের সর্বস্তরে সংবিধান হিসেবে গ্রহণ না করা। শান্তি, স্বস্তি, উন্নতি, অগ্রগতি, প্রগতির জীবন্ত সাক্ষী হিসেবে দণ্ডায়মান মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও বিশ্ব নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুমহান আদর্শ।

মুসলিমরা যদি এই মহাসংকট ও দুরবস্থার সমাধানে এখনই এগিয়ে না আসে, তাহলে ভবিষ্যতে বিশ্ব মুসলিমের মাথার উপরে থেকে যাবে আরও মহাবিপদের আশঙ্কাজনক ধ্বংসাত্মক হুমকি। আত্মভোলা মুসলিম জাতির ভাবধারা দেখেশুনে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেন—

শক্তি সিন্ধু মাঝে রহি হায়
শক্তি পেল না যে,
মরিবার বহু পূর্বে জানিও
মরিয়া গিয়াছে সে।

মুসলিম জাতির হাতে সবকিছু থাকতে যদি তারা নিজেদের ঐতিহ্য রক্ষায় আজও সচেতন না হয়, তাহলে কবির কথাই বাস্তব রূপ নিবে। গতানুগতিকভাবে গড্ডালিকা প্রবাহে যদি মুসলিমরা বিজাতীয় অনুকরণ-অনুসরণ করে চলতে থাকে, তাহলে জাতীয় জীবনে নেমে আসবে এর চেয়ে মারাত্মক অভিশাপ। ফলে বিপন্ন হবে গোটা জাতি। নেমে আসবে জ্বালাময়ী ধ্বংসের বিভীষিকা। অশান্তির দাবানল দাউদাউ করে জ্বলতে থাকবে পৃথিবীতে। তাই সুপ্ত মুসলিম মিল্লাত যদি সে মহাবিপদ ঠেকাতে চান, তাহলে আজই শপথ নিতে হবে মানব রচিত কোনো মতাদর্শ আমরা মানব না। শুধু তাই নয়, মানব রচিত সকল মতাদর্শকে খড়কুটার ন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে জাতীয় জীবনের সকল স্তরে আল-কুরআনের প্রতিফলন ঘটাব। আদর্শ নেতা হিসেবে মানবতার মুক্তির দিশারী প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মেনে নিব। যদি আমরা মুসলিম জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে আবার জেগে উঠি তথা হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ি, তবে বিজয়ের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা সময়ের ব্যবধান মাত্র।

আদ-দাওয়া ইলাল্লহ: এসো! আল্লাহর পথে...

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

ভূমিকা: আমাদের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর মনোনীত ছিরাতে মুস্তাক্বীম বা সহজ-সরল পথ ইসলাম। ইসলামের অপর নাম জ্ঞান। জ্ঞানার্জন ছাড়া আল্লাহর পথ সম্পর্কে জানা অসম্ভব। ইসলামের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে বহু ভাষায় গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যেমন ফাযায়েলে আমলের উপর অসংখ্য বই রয়েছে। মানুষ যখন শুধু ফাযায়েলে আমল পড়ে, তখন সে ইসলামের নির্দিষ্ট একটি অংশ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে; ইসলামের জিহাদ বা রাজনীতি সম্পর্কে সে অজ্ঞ থাকে। ঠিক তেমনি মাদরাসাগুলোতে ফিক্বহী মাসআলা-মাসায়েলের আলোচনা বলতে পবিত্রতা ও ছালাত-কেন্দ্রিক আলোচনাতেই বেশি হয়। আবার যারা সঊদী আরব বা মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করে এসেছেন, তাদের আলোচনা ও লেখনীতে আক্বীদার বিষয়টি বেশি গুরুত্ব পায়। আবার যারা ইসলামী রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, তাদের মুখে সবসময় ইসলামের রাজনৈতিক বিষয়টি প্রাধান্য পায়। আবার কেউ শুধু জিহাদের আয়াত ও হাদীছ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন।

ফলত ইসলামের পূর্ণাঙ্গ চিত্র ধারণ করতে মানুষ ব্যর্থ হয়। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ চিত্র আমাদের সামনে না থাকার কারণেই মূলত আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ফেতনার ফাঁদে পা দিয়ে দিই। আমাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতভেদ তৈরি হয়। কেননা আমরা প্রত্যেকেই ইসলামকে নিজ নিজ জায়গা থেকে নিজ নিজ জ্ঞান অনুযায়ী দেখার চেষ্টা করি। কেউই ইসলামকে তার পূর্ণাঙ্গ চিত্রে দেখার চেষ্টা করি না।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের এমন একটি লেখনীর খুব প্রয়োজন, যেখানে সমগ্র ইসলামের সারমর্ম থাকবে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সার নির্যাস থাকবে। মানুষকে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা শিখিয়েছেন, সেই শিক্ষার মূল সারাংশ থাকবে। যাতে করে মানুষ ইসলামের পরিপূর্ণ চিত্রটা একবারে জানতে পারে। যা অতি বিস্তারিত হবে না আবার অতি সংক্ষিপ্ত হবে না। আল-হামদুলিল্লাহ দেরিতে হলেও আমরা আদ-দাওয়া ইলাল্লহ বা আল্লাহর পথে আহ্বান নামে সেই লেখা মাসিক আল-ইতিছামের পাঠকদের জন্য আরম্ভ করতে যাচ্ছি। আমরা দু'আ করি মহান আল্লাহ যেন আমাদের এই ধারাবাহিক লেখনীতে বরকত দান করেন- আমীন!

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বিএ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

ইসলাম কী?

سلم 'সিলমুন' শব্দমূল থেকে ইসলাম শব্দটি নির্গত, তার শাব্দিক অর্থ শান্তি ও নিরাপত্তা। আর ইসলাম শব্দের শাব্দিক অর্থ আত্মসমর্পণ করা। আত্মসমর্পণ দ্বারা উদ্দেশ্য মহান আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করা। আর শান্তি-নিরাপত্তা দ্বারা উদ্দেশ্য দুনিয়াবী ও পরকালীন উভয় জগতে শান্তি ও নিরাপত্তা। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য সবচেয়ে বড় নেয়ামত হচ্ছে শান্তি ও নিরাপত্তা। জীবনে যদি শান্তিই না থাকে এবং জান ও মালের নিরাপত্তা না থাকে, তাহলে অর্থসম্পদ সবকিছু মূল্যহীন হয়ে পড়ে। মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় চাহিদা হচ্ছে জানমালের শান্তি ও নিরাপত্তা। আর সেই শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব— যদি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সকল কিছুই মহান আল্লাহর দরবারে একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণ করে। ইসলামের সকল বিধিবিধানের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে মানুষকে আল্লাহর সামনে একান্ত অনুগত করার মাধ্যমে মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইহকালে ও পরকালে নিরঙ্কুশ শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা। আত্মসমর্পণ বিষয়টি আরও ভালোভাবে বুঝার জন্য কুরআনে কারীমে যেখানে ইসলাম শব্দটি ক্রিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, তার একটি উদাহরণ দেখি। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ - وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ - قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾

'আর যখন তারা উভয়েই আত্মসমর্পণ করলেন এবং ইবরাহীম তার সন্তানকে যবেহ করার জন্য শুইয়ে দিলেন, তখন আমি আল্লাহ ডাক দিয়ে বললাম, হে ইবরাহীম! আপনার স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছেন। আমরা এভাবেই ইহসানকারীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি' *(আছ-ছাফফাত, ৩৭/১০৩-১০৫)*।

পিতা সন্তানকে কুরবানী করবেন। পিতা-পুত্র উভয়েই রাজী। কারও কোনো প্রশ্ন নেই। যবেহ করার জন্য পিতা প্রস্তুত। যবেহ হওয়ার জন্য সন্তান প্রস্তুত। পিতা-পুত্র উভয়ে এত বড় একটি অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্য কোনো প্রশ্ন ছাড়াই রাজী হওয়ার একমাত্র কারণ তারা উভয়েই বিশ্বাস করেন এটি আল্লাহর আদেশ। আল্লাহর আদেশের সামনে এই ধরনের আত্মসমর্পণকে ইসলাম বলা হয়।

যাহোক, আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণের জন্য তাওহীদের বিশ্বাস জরুরী। যার মধ্যে তাওহীদের বিশ্বাস নেই, সে যতই বাহ্যিক অর্থে নিজেকে আল্লাহর আনুগত্যকারী হিসেবে প্রদর্শন করুক, সে আসলে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে

পারেনি। সুতরাং আমাদের আলোচনায় সর্বাগ্রে স্থান পাবে তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ব। তারপর আল্লাহর প্রেরিত রাসূলগণ ও তাদের আনীত কিতাবসমূহ, ফেরেশতাগণ, মৃত্যু ও পরকাল, ভাগ্যের লিখন ইত্যাদি বিষয় স্থান পাবে।

তাওহীদ কী ও কেন?

তাওহীদ শব্দের শাব্দিক অর্থ একত্ব। অর্থাৎ মহান আল্লাহর একত্ব। ইংরেজিতে বলা হয় Monotheism.

মহান আল্লাহর একত্ব দ্বারা উদ্দেশ্য সকল ক্ষেত্রে সকল অবস্থায় চিরন্তন ও চিরস্থায়ী একত্ব। যেমন মহান আল্লাহ রব বা প্রতিপালক হিসেবে একক। তিনি একাই সমগ্র পৃথিবী পরিচালনা করছেন। মহান আল্লাহ ইলাহ হিসেবে একক। তথা তিনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য সত্তা; আর কেউ নয়। মহান আল্লাহ তাঁর নাম ও গুণাবলিতে একক। তথা তাঁর গুণের মতো কারও গুণ নেই। তাঁর নামের মতো কারও নাম হতে পারে না। এই তাওহীদই ইসলামের মূল বিশ্বাস। কেননা আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ একত্বে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ছাড়া তাঁর সামনে পূর্ণ আত্মসমর্পণ কখনোই সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর তাওহীদে যত বেশি মযবূত বিশ্বাসী, সে নিজেকে আল্লাহর সিদ্ধান্তের সামনে তত বেশি আত্মসমর্পণ করতে পারবে। আর যত বেশি আল্লাহর সিদ্ধান্তের সামনে আত্মসমর্পণ করতে পারবে, সে তত বেশি মানসিকভাবে শক্তিশালী হতাশামুক্ত শান্তিময় জীবনযাপন করতে পারবে। পাশাপাশি সে পৃথিবীতে শক্তিশালী ও প্রভাব বিস্তারকারী হিসেবে আবির্ভূত হবে। যেমনটা ছিলেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম, দাঊদ ও সুলায়মান আলাইহিমাস সালাম এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অতএব, তাওহীদ হচ্ছে পৃথিবীর এমন এক মহাসত্য, যার মধ্যে মানবজাতির সকল সমস্যার সমাধান নিহিত রয়েছে। নিম্নে আমরা তাওহীদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করছি।

প্রতিপালক কে?

তাওহীদ ভালোভাবে বুঝতে হলে সবার আগে আমাদেরকে মহান আল্লাহর রুবূবিয়্যাত বা প্রতিপালকত্ব বুঝতে হবে। প্রতিপালক শব্দের অর্থ হচ্ছে যিনি লালনপালন করেন। আর লালনপালন দ্বারা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল কিছুই উদ্দেশ্য।

এই পৃথিবীতে আমাদের আগমন থেকে বিদায় নেওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিই অমোঘ নিয়মের বাঁধনে আবদ্ধ। আমরা নিজ সিদ্ধান্তে কেউ এই পৃথিবীতে আসিনি। আমাদের কখন কোথায় কোন পরিবারে কীভাবে জন্ম হবে তার পুরোটাই আমাদের এবং আমাদের পিতা-মাতার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। পৃথিবীতে আগমনের পর অন্তত আড়াই তিন বছর পর্যন্ত আমরা পরিপূর্ণরূপে অন্যের করুণার উপর প্রতিপালিত হই। যখন থেকে আমরা বড় হই এবং নিজেরা খাওয়া ও চলা শিখি, তখনও আমরা এক অদৃশ্য শক্তির অমোঘ নিয়ন্ত্রণে থাকি। আমরা পৃথিবীতে যা কিছু খাই না কেন, তার সবকিছুই মাটি, পানি ও সূর্য থেকে শক্তি সঞ্চার করে থাকে। আমরা যদি গরু বা মুরগির গোশত খেয়ে শক্তি সঞ্চার করি, তাহলে গরু বা মুরগি সেই শক্তি সঞ্চার করেছে ঘাস-পাতাসহ অন্যান্য উদ্ভিদ ও খাদ্য গ্রহণ করে। আর সেই উদ্ভিদ ও খাদ্যদ্রব্যগুলো মাটি, পানি ও সূর্যের শক্তি থেকে শক্তি গ্রহণ করেছে। যেকোনো গাছকে যদি দীর্ঘদিন সূর্যের তাপ থেকে দূরে রাখা হয়, কোনো কিছু দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়, তাহলে গাছটি একসময় মারা যাবে। ঠিক তেমনি যদি গাছটিতে দীর্ঘদিন পানি দেওয়া না হয় অথবা গাছের গোড়া থেকে মাটি সরিয়ে নেওয়া হয়, কিছুদিনের মধ্যে গাছটি মারা যাবে। তথা পৃথিবীতে শুধু আমাদের নয়; পৃথিবীর সকল প্রাণী ও জীবজন্তুর এমনকি সকল উদ্ভিদের বেঁচে থাকা নির্ভর করছে আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা সূর্যের আলো, পানি ও মাটির উপর। এই তিনটিই আমরা সরাসরি প্রাকৃতিক উৎস থেকে গ্রহণ করে থাকি। যার উপর পৃথিবীর কোনো শক্তির কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। শুধু তাই নয়, আমরা বেঁচে থাকার জন্য যে অক্সিজেন গ্রহণ করি, সেটিও সম্পূর্ণরূপে আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এমনকি আমাদের শরীর যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো ব্যবহার করে বিভিন্ন কাজ করে থাকি, সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোও সম্পূর্ণরূপে আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে কাজ করে থাকে। যেমন আমরা যদি প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট গ্রহণ করি, আমাদের রক্তে প্রচুর পরিমাণে গ্লুকোজ বা চিনির পরিমাণ বেড়ে যাবে। আমরা দৈনিক শরীরে যে পরিমাণ ক্যালরি পাঠাই, সে পরিমাণ ক্যালরি যদি খরচ না করি, তাহলে সেগুলো ফ্যাট হিসেবে আমাদের শরীরে জমা হয়। ধীরে ধীরে ডায়াবেটিস, ফ্যাটি লিভার ইত্যাদি রোগ বাসা বাঁধে। লিভারের রক্ত শোধন কাজ, কিডনির পানি শোধন কাজ এবং ফুসফুসের শ্বাসগ্রহণ ও প্রদানের কাজের নিয়মাবলি সম্পূর্ণরূপে আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। আমরা কখনোই এই অঙ্গগুলোকে নিজের ইচ্ছামতো কাজে লাগাতে পারব না। যেমন কার্ব বা শর্করা খেয়ে রক্তকে বলতে পারব না—তুমি এটিকে পরিপূর্ণ প্রোটিন হিসেবে গ্রহণ করো। প্রোটিন খেয়ে বলতে পারব না—তুমি এটিকে শর্করা হিসেবে গ্রহণ করো। সারাদিন শুয়েবসে থেকে লিভারকে বলতে পারব না—তুমি তোমার ফ্যাট গলিয়ে ফেলো। এক কথায় আমাদের স্বাধীনতা শুধু খাবার গ্রহণ পর্যন্ত। কোন খাবারটি গ্রহণ করব আর কোন খাবারটি গ্রহণ করব না এতটুকু। কিন্তু খাবার তৈরি হওয়া থেকে শুরু করে আমাদের পেটে যাওয়ার পর তার পাচন প্রক্রিয়া ও আমাদের সুস্থ ও বেঁচে থাকা পুরোটাই আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এক অমোঘ অপরিবর্তনীয় ও অলঙ্ঘনীয় নিয়মে পরিচালিত হতে থাকে।

অদৃশ্যে থেকে যিনি এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছেন, তিনিই মূলত প্রকৃতপক্ষে প্রতিপালক। মহান আল্লাহ এই বিষয়গুলোকেই কুরআন মাজীদে বিভিন্ন সহজ উদাহরণ দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। আসমান ও জমিন সৃষ্টির কথা বলেছেন। আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণের কথা বলেছেন। পাহাড়-পর্বত স্থাপন, নদীনালা প্রবাহিত করা ও গাছপালাকে অঙ্কুরোদগম ঘটানো এবং বাগানে পরিণত করা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের কথা বলেছেন।

উল্লিখিত বিষয়গুলো অতি সহজেই স্বাভাবিক দৃষ্টিতেই অনুমেয় যে, এগুলো মানুষের পক্ষে সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। মানুষ খুব ভালোভাবেই জানে বিজ্ঞান যতই উন্নত হোক না কেন, তাদের পক্ষে পাহাড়-পর্বত স্থাপন করা, নদীনালা প্রবাহিত করা, আসমান ও যমীন সৃষ্টি করা, গাছপালা অঙ্কুরোদগম করানো সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। সৃষ্টি করা তো বহু দূরের কথা— এগুলোর অনেক কিছুর রহস্য ভেদ করাও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। যেমন মহাকাশ। মহাকাশ এত বিশাল যে, বিজ্ঞানীরা নিজেরাও জানে না তারা মহাকাশের কতটুকু অংশ আবিষ্কার করতে পেরেছে। একটি বিশাল দেয়ালের সাথে চোখ লাগিয়ে দেয়ালের যতটুকু অংশ দেখা যায়, তারা মহাকাশের ততটুকু অংশও আবিষ্কার করতে পেরেছে কিনা তা তারা জানে না। কিছুদিন পূর্বে জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ যে ছবি পাঠিয়েছে, নাসার দাবি অনুযায়ী একটি বালুকণা আকাশের দিকে তুলে ধরলে আকাশের তুলনায় সেই বালুকণা যত ছোট দেখা যায়, বিশাল মহাকাশের ততটুকু অংশের ছবি হতে পারে এই ছবি।

বিজ্ঞানীরা মহাকাশ সম্পর্কে যতটুকু আবিষ্কার করেছেন, তার সারমর্ম হলো— আমরা একটি গ্রহে বসবাস করছি, যার নাম পৃথিবী। এই গ্রহটি শূন্যে ভাসমান, আর পৃথিবী থেকে যেদিকেই যাওয়া হোক না কেন, তা মহাশূন্যেরই অংশ। আমাদের এই পৃথিবীর আশপাশে রয়েছে আরও কিছু গ্রহ, যেমন- সূর্য, বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ইত্যাদি। এই গ্রহগুলো সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান বিধায় একে সৌরজগৎ (Solar System) বলা হয়। এই সৌরজগৎ ছাড়িয়ে গেলে আমরা আরও অনেক সৌরজগৎ দেখতে পাই, যেগুলো মিলিয়ে একটি গ্যালাক্সি তৈরি করে—যার নাম 'মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি'।

এই গ্যালাক্সির বাইরেও রয়েছে অসংখ্য গ্যালাক্সি; প্রতিটি গ্যালাক্সিতে রয়েছে শত শত সৌরজগৎ, যাদের মাঝে অনেকগুলোতেই হয়তো আমাদের পৃথিবীর মতো গ্রহ রয়েছে। আল্লাহু আকবার! এত বিশাল এই মহাবিশ্ব নিশ্চয়ই কারও দ্বারা সৃষ্ট। সেই সৃষ্টিকর্তাই হলেন একমাত্র রব্বুল আলামীন।

তবে এসবই প্রথম আসমানের নিচের জগৎ। কেবল প্রথম আসমান পর্যন্ত এই বিশালতা যদি হয়, তাহলে সাত আসমান, কুরসী এবং আরশের বিশালতা কীরূপ হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

هَلْ تَدْرُونَ كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ، وَمِنْ كُلِّ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ.

'তোমরা কি জানো আকাশ ও জমিনের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত?' তারা বলল, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন'। তখন তিনি বললেন, 'তাদের মাঝে দূরত্ব ৫০০ বছরের পথ। আর এক আকাশ থেকে অপর আকাশের দূরত্বও ৫০০ বছরের পথ'।[১]

এখানে '৫০০ বছরের পথ' বলতে বোঝানো হয়েছে— সবচেয়ে দ্রুতগামী কোনো বাহনের গতিতে হাঁটলে তা অতিক্রম করতে সময় লাগবে ৫০০ বছর। রাসূল ﷺ আরও বলেন, مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرَضُونَ السَّبْعُ فِي الْكُرْسِيِّ إِلَّا كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ 'সাত আসমান ও সাত জমিন একত্রিত করলেও তা আল্লাহর কুরসীর সামনে এমন, যেন একটি আংটি মরুভূমিতে পড়ে আছে'।[২] তিনি আরও বলেন, وَمَا الْكُرْسِيُّ فِي الْعَرْشِ إِلَّا كَحَلْقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ أُلْقِيَتْ بَيْنَ فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ 'আর কুরসী আল্লাহর আরশের সামনে এমন, যেন একটি লোহার আংটি বিশাল মরুভূমিতে পড়ে আছে'।[৩]

তাহলে কল্পনা করুন, মানুষ এখনো শুধু প্রথম আসমানের নিচের মহাশূন্যের সামান্য অংশ আবিষ্কার করতে পেরেছে, যার তুলনায় সব আসমান ও জমিন আল্লাহর কুরসীর সামনে একটি আংটির মতো। আর কুরসীও আল্লাহর আরশের সামনে তেমনই একটি ক্ষুদ্র বস্তু।

সারসংক্ষেপ: সার্বিকভাবে বলা যায়— এই মহাবিশ্ব, মহাশূন্য, জীবজগৎ, উদ্ভিদ, গ্রহ-নক্ষত্র, সবকিছুই নির্দিষ্ট ও অনতিক্রমযোগ্য নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে। এ নিয়মগুলো কারও দ্বারা নির্ধারিত—যিনি সর্বশক্তিমান, সবকিছুর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণকারী। তাঁকেই বলা হয়, 'রাব্বুল আলামীন'।
আর এই সত্তাকে তাঁর রুবূবিয়্যাত তথা পালনকারীরূপে একক স্বীকৃতি দেওয়ার নামই হলো, তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ।

(ইনশা-আল্লাহ চলবে)

---

১. আবূ দাঊদ, হা/৪৭২৩; তিরমিযী, হা/৩৩২০; ছহীহুল জামে', হা/২১৯৮।
২. সিলসিলা ছহীহা, হা/১০৯।
৩. সিলসিলা ছহীহা, হা/১০৯।

জাতির অধঃপতনের পাঁচ সিঁড়ি

*-মাহমুদ হাসান ফাহিম**

মানুষের কর্মের কারণেই তার অধঃপতনের সূচনা হয়। পৃথিবীর সব জাতিই চায় উন্নতি। তারপরও অনেকে অধঃপতনের শিকার হয়। অপরাধ যখন ব্যক্তি পর্যায়ে থাকে, তখন অধঃপতন ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। আবার যখনই ব্যাপকহারে কোনো দেশ বা জাতি অপরাধে লিপ্ত হয়, তখন সে অপরাধের দায় সকলকেই বহন করতে হয়। তখনই শুরু হয় দেশ ও জাতির অধঃপতন।

কোনো দেশে পাঁচ ধরনের অপরাধ চলমান থাকলে তারা কখনই উন্নতির শিখরে পৌঁছতে পারবে না, তাদের অধঃপতন সুনিশ্চিত।

(১) অশ্লীলতা: শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। তার কাজই হলো অন্যায় ও অশ্লীলতার আদেশ দেওয়া এবং ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে সব রকমের অশান্তি নিশ্চিত করা। ইসলাম মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ চায়, পরকালীন শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার আহ্বান জানায় এবং সকল প্রকার অশ্লীলতাকে নিষেধ করে। একারণেই শয়তানকে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ﴾ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা যমীনে যা হালাল ও পবিত্র, তা থেকে ভক্ষণ করো। শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৬৮-১৬৯)*।

ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের নিকট এসে বললেন, ‘...যখনই কোনো জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে (যেমন সূদ, ঘুষ, যেনা ইত্যাদি), তখন তাদের মধ্যে মহামারি আকারে প্লেগ ও এমন সব ব্যাধির জন্ম হয়, যা পূর্বেকার লোকদের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি...’।[১]

(২) ওযন ও পরিমাপে কারচুপি: সঠিকভাবে মেপে দেওয়া হচ্ছে লেনদেনের স্বচ্ছতা। বেচাকেনায় ওযন করার সময় সঠিকভাবে দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। ওযনে কারচুপি করার অপরাধে পূর্বে এক জাতি ধ্বংসও হয়েছে। আগত উম্মতকে সে বিষয়ে সতর্ক সংকেত দিয়ে কুরআনে কারীমে সেই ঘটনার বিশদ বিবরণ এসেছে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلًا﴾ ‘মেপে দেওয়ার সময় পূর্ণরূপে মেপে দাও, সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওযন করে দাও। এটা পরিণামের দিকদিয়ে উত্তম ও উৎকৃষ্ট’ *(বনী ইসরাঈল, ১৭/৩৫)*। হাদীছের ভাষায়, وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلاَّ أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ ‘যখন কোনো জাতি ওযন ও পরিমাপে কম দেয়, তখন তাদের ওপর নেমে আসে দুর্ভিক্ষ ও কঠিন বিপদ-মুছীবত আর তাদের ওপর শুরু হয় যালেম শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়ন’।[২]

(৩) যাকাত না দেওয়া: যাকাত মানে সম্পদ পরিশুদ্ধির বিধান। ধনীর সম্পদে গরীবের অধিকার হলো যাকাত। যাকাত না দিয়ে সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখা গরীব-দুঃখীর সম্পদ আত্মসাৎ করারই নামান্তর। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ﴾ ‘তাদের ধনসম্পদে রয়েছে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতের হক্ব’ *(আয-যারিয়াত, ৫১/১৯)*।

সম্পদের সুষম বণ্টন না থাকার কারণেই সমাজের সর্বত্র আমরা অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হই। যে রাষ্ট্রের অধিবাসীদের অধিকার সুনিশ্চিত নয়, তাতে সফলতা কামনা করা মানে বোকামি ছাড়া আর কী হতে পারে?

হাদীছের ভাষায়, وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلاَّ مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلاَ الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا ‘কোনো জাতি যখন সম্পদের যাকাত আদায় করা থেকে বিরত থাকে, তখন তাদেরকে আসমানের পানি থেকে বঞ্চিত করা হয়। যদি ভূ-পৃষ্ঠে চতুষ্পদ জন্তু-জানোয়ার (গরু, ছাগল, ভেড়া, কুকুর, ঘোড়া ইত্যাদি) না থাকত, তাহলে তাদেরকে বৃষ্টির পানি দেওয়া হতো না’।[৩]

প্রবন্ধটির বাকী অংশ ৩৩ নং পৃষ্ঠায়

* শিক্ষক, বায়তুল আকরাম মসজিদ ও মাদরাসা কমপ্লেক্স, সুরতরঙ্গ রোড, টঙ্গী, গাজীপুর।

১. ইবনু মাজাহ, হা/৪০১৯; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/৭৬৪।

২. ইবনু মাজাহ, হা/৪০১৯, হাসান।

৩. ইবনু মাজাহ, হা/৪০১৯।

আল্লাহর নৈকট্য লাভ

[১৮ যুলক্বা'দাহ, ১৪৪৬ হি. মোতাবেক ১৬ মে, ২০২৫ মদীনা মুনাওয়ারার আল-মাসজিদুল হারামে (মসজিদে নববী) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন ***শায়খ ড. খালেদ আল-মুহান্না*** *হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর আরবী বিভাগের সম্মানিত পিএইচডি গবেষক* ***আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ।*** *খুৎবাটি* ***'মাসিক আল-ইতিছাম'****-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]*

প্রথম খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি অতি নিকটবর্তী, দু'আ কবুলকারী, অভিভাবক, সাহায্যকারী ও হিসাব গ্রহণকারী। তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে যাকে পছন্দ করেন তাকে নিজের নৈকট্য দেন। আমি দরূদ ও সালাম পাঠ করছি তাঁর বান্দা ও রাসূল, আমাদের নেতা ও নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি, যিনি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি এবং সৃষ্টির সর্বসেরা জীব।

অতঃপর, হে মানুষ! আপনারা আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের তাক্বওয়া অবলম্বন করুন এবং তাক্বওয়ার বাণী 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-কে দৃঢ়ভাবে ধারণ করুন। কেননা সেই ব্যক্তিই সফল, যে তার অন্তরে তাক্বওয়া ধারণ করে এবং আখেরাতকে সামনে রাখে। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আর প্রত্যেকের উচিত চিন্তা করে দেখা সে আগামীকালের জন্য কী প্রেরণ করেছে। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যা কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত' *(আল-হাশর, ৫৯/১৮)*।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! সেই বান্দাই প্রকৃতভাবে সফল ও আলোকিত পথের পথিক, যে তার প্রতিপালকের দিকে সহজ-সরল পথে চলে, কোনোরূপ বক্রতা অবলম্বন ছাড়াই। সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত না হয়ে এবং সরল পথ থেকে গোমরাহ না হয়ে তার মহিমান্বিত মালিকের নিকটবর্তী হয়। সে তার প্রতিপালকের দেখানো পথে সৎ ও একনিষ্ঠ আমলের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ করে। সে আল্লাহকে পরিপূর্ণ ভালোবাসে, পরম শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সাথে তাঁকে সম্মান করে, তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ বিনয়াবনত হয় এবং তাঁর উপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল হয়। সে তাঁর কাছে ছওয়াব কামনা করে এবং তাঁর শাস্তি থেকে ভয় পায়। সে তাদের গুণাবলিতে নিজেকে তৈরি করে, যাদেরকে অনুকরণ করতে আল্লাহ আদেশ করেছেন, যেমন- নবীগণ, রাসূলগণ এবং আল্লাহর নির্বাচিত নেককার বান্দাগণ। যাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, 'তারা যাদেরকে ডাকে, তারা নিজেরাই তো তাদের রবের কাছে নৈকট্যের মাধ্যমে অনুসন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে তাঁর নিকটতর? আর তারা তাঁর রহমতের আশা করে এবং তাঁর আযাবকে ভয় করে। নিশ্চয় তোমার রবের আযাব ভীতিকর' *(বনী ইসরাঈল, ১৭/৫৭)*।

হে মুসলিমগণ! একজন বান্দার তার প্রতিপালকের নিকটবর্তী হওয়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো আল্লাহ তাঁর উপর যেসব বিষয় ফরয করেছেন, সেগুলো যথাযথভাবে পালন করা। যেমনটা হাদীছে কুদসীর মধ্যে মহান আল্লাহ বলেন, 'আমার বান্দা কেবল তার উপর ফরযকৃত আমলের দ্বারাই আমার নৈকট্য লাভ করে'।[১] আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় বিষয় হলো তাঁর ইবাদতে তাওহীদ বজায় রাখা এবং তাঁর জন্য একনিষ্ঠভাবে দ্বীন পালন করা। এটি তাঁর বান্দাদের উপর সবচেয়ে বড় ফরয আর আল্লাহর কাছে সবচেয়ে অপছন্দনীয় ও ঘৃণিত বিষয় হলো তাঁর সাথে শিরক করা। এটিই হলো সবচেয়ে বড় নিষিদ্ধ বিষয়, যাকে আল্লাহ সবচেয়ে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

জেনে রাখুন! ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরয, যা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবি রাখে এবং মহান অধিপতি আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো ছালাত। মহান আল্লাহ বলেন, 'কখনো নয়, তুমি তার আনুগত্য করবে না। আর সিজদা করো এবং নৈকট্য লাভ করো' *(আল-আলাক্ব, ৯৬/১৯)*।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'বান্দা সিজদারত অবস্থায়ই তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ লাভের সর্বোত্তম মুহূর্ত। অতএব, তোমরা আল্লাহর কাছে অধিক পরিমাণে দু'আ করো'।[২] এখানে সিজদার কথা বলার কারণ হলো বান্দার ছালাতের সিজদা হচ্ছে তার সর্বোচ্চ দাসত্ব ও বিনয় প্রকাশের মাধ্যম। আর সীমাহীন মর্যাদা একমাত্র আল্লাহর জন্যই। তাই আপনি যত আল্লাহর মহান গুণাবলির বিপরীতে নিজেকে বিনম্র করবেন, ততই আপনি তাঁর সান্নিধ্য ও জান্নাতের নিকটবর্তী হবেন। আর বান্দার তাঁর রবের প্রতি সত্যিকারের বিনয় প্রকাশ দুইভাবে প্রমাণিত হয়। যথা—

প্রথমত, বান্দা তার প্রভুর হুকুম ও নিষেধ মানার ক্ষেত্রে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে এবং তার নির্ধারিত তাক্বদীর বা ফয়সালার ক্ষেত্রে ধৈর্য ও বিনয়-নম্রতার পরিচয় দেয়।

দ্বিতীয়ত, বান্দা নিজের ভেতর থেকে অহংকার ও আত্মগর্বের পোশাক খুলে ফেলে এবং বিনয়-নম্রতা ও নতজানুর পোশাক

১. মুসনাদে বাযযার, হা/৮৭৫০।
২. ছহীহ মুসলিম, হা/৪৮২।

স্থায়ীভাবে গ্রহণ করে। এ প্রসঙ্গে শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়্যা (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, বান্দা যতই আল্লাহর সামনে নিজেকে অধিক নিঃস্ব ও বিনম্র হিসেবে প্রকাশ করে, সে ততই আল্লাহর নিকটবর্তী ও সম্মানিত হয়।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! একজন আল্লাহভক্ত বান্দা দ্বীনের ফরয ইবাদতের পর নফল ইবাদতের মাধ্যমে ক্রমাগতভাবে তার রবের নৈকট্য লাভের চেষ্টা করতে থাকে। সে তার উপর ওয়াজিব বিষয়গুলো পালনের সাথে সাথে নফল, মুস্তাহাব ও অন্যান্য মুস্তাহাব আমলগুলোও সম্পাদন করে থাকে যতক্ষণ না আল্লাহ তাকে ভালোবেসে ফেলেন।

আর যখন আল্লাহ কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তিনি তার অভিভাবক ও সহায় হয়ে যান। ফলে আল্লাহ তার কান ও চোখকে হারাম থেকে রক্ষা করেন, তার হাতকে সীমালঙ্ঘন থেকে রক্ষা করেন এবং তার পদযুগলকে আল্লাহর অসন্তুষ্টির পথে চলা থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। সে তখন কেবল তাঁর রব ও মাওলার সন্তুষ্টির পথেই চলতে থাকে। এর ফলে তার আত্মা পরিশুদ্ধ হয়, তার অন্তর পবিত্র হয়, সে আসমান ও যমীনের রবের নৈকট্য লাভ করে এবং সর্বদা তার দু'আ কবুল করা হয়। এর প্রমাণ হলো একটি হাদীছে কুদসী, যাতে মহান আল্লাহ বলেন, 'বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। এমনকি অবশেষে আমি তাকে আমার এমন প্রিয়ভাজন বানিয়ে নিই যে, আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে আর আমিই তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমিই তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে চলে। সে যদি আমার কাছে কোনো কিছু চায়, তবে আমি নিশ্চয়ই তাকে তা দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাহলে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দেই'।[৩]

আর যখনই কোনো বান্দা তাঁর রবের নিকটবর্তী হয়, তখন তার রবও তাকে কাছে টেনে নেন এবং তাকে এক মহাসুসংবাদ প্রদান করেন যাতে তার অন্তর আনন্দ ও খুশিতে ভরে যায়। মৃত্যুর সময় সেই নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাকে বিশ্রাম, উত্তম জীবনোপকরণ, সুখময় জান্নাত ও সম্মানিত রিযিক্বের সুসংবাদ দেওয়া হয়, যা আল্লাহ তাআলা নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। তার প্রমাণ রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও অতি পবিত্র আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীতে, তিনি বলেন, 'অতঃপর সে যদি (আল্লাহর) নৈকট্যপ্রাপ্তদের একজন হয়; তবে তার জন্য থাকবে বিশ্রাম, উত্তম জীবনোপকরণ ও সুখময় জান্নাত' *(আল-ওয়াক্বিআহ, ৫৬/৮৮-৮৯)*।

হে মুসলিমগণ! আল্লাহর প্রিয় বান্দারাই কেবল তাঁর নৈকট্য লাভ করেন। তারা নিজেদের সৎ আমলের মাধ্যমে তাঁর সাথে সুসম্পর্ক গড়েন এবং আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেন। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সর্বোচ্চ নৈকট্য দান করেন। যেমন সর্বোচ্চ নৈকট্য লাভ করেছিলেন তাঁর দুই প্রিয় বান্দা মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ও ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) (আল্লাহ তাঁদের প্রতি শান্তি বর্ষণ করুন)। আল্লাহ তাঁদের উভয়কেই 'খলীল' (ঘনিষ্ঠ বন্ধু) হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, 'আর আল্লাহ ইবরাহীমকে পরম বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন' *(আন-নিসা, ৪/১২৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'আমি আমার উম্মতের কাউকে যদি আন্তরিক বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তবে আবূ বকর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কেই গ্রহণ করতাম। তবে তিনি আমার ভাই ও আমার ছাহাবী'।[৪]

আর মহান আল্লাহ কবর জীবনে তাঁদের উভয়ের নফসের অবস্থান করেছেন সর্বোচ্চ মর্যাদায় আর জান্নাতে তাঁদের মর্যাদা রেখেছেন সর্বোচ্চ স্তরে। অতঃপর তাঁদের পরে সর্বোচ্চ নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা হলেন মূসা (আলাইহিস সালাম), যিনি আল্লাহর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তাঁর প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বোত্তম দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক। মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি তাকে তূর পর্বতের ডান দিক থেকে ডেকেছিলাম এবং অন্তরঙ্গ আলাপের উদ্দেশ্যে তাকে আমার নিকটবর্তী করেছিলাম' *(মারইয়াম, ১৯/৫২)*। এরপর সর্বোচ্চ নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা হলেন ঈসা (আলাইহিস সালাম), তারপর নূহ (আলাইহিস সালাম), অতঃপর অন্যান্য সব রাসূল ও নবীগণ। তাঁদের সকলের প্রতি দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক। তাদের পর সর্বোচ্চ নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি হলেন, আবূ বকর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু), তারপর উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু), তারপর উছমান ও আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা), এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর অন্যান্য ছাহাবীগণ (আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন)। তাঁদের মর্যাদা নির্ধারিত হয়েছে ঈমানে অগ্রগামী হওয়া, হিজরত করা এবং রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণের ভিত্তিতে। এরপর সর্বোচ্চ নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন নবীদের ছাহাবীগণ, তারপর এই উম্মতের সর্বোত্তম তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈগণ এবং তাদের পর এ উম্মতের পথপ্রদর্শক আলেম ও ওলীগণ।

হে ঈমানদার ভ্রাতৃমণ্ডলী! আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি যে অনুগ্রহ, সহজতা এবং সম্মান দান করেছেন তার অন্যতম হলো তিনি বান্দাদের ওপর এমন কোনো বিধান চাপিয়ে দেননি যে, তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে কোনো

৩. ছহীহ বুখারী, হা/৬৫০২।

৪. ছহীহ বুখারী, হা/৩৬৫৬।

মাখলূকের মধ্যস্থতার প্রয়োজন হবে, যার মাধ্যমে তারা নিজেদের প্রয়োজন তাঁর কাছ পৌঁছাবে অথবা তার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য চাওয়া হবে বা যে তাদেরকে রবের নিকটে পৌঁছে দিবে। বরং তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য অনুগ্রহ ও দয়ার দরজা সর্বদা খুলে রেখেছেন, যাতে তারা নিজেদের সৎকর্মের মাধ্যমে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করে এবং সরাসরি মুনাজাতের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারে। তারা কেবল তাঁর সাথেই মুনাজাত করবে, অন্য কারো সাথে নয়; কেবল তাঁকেই ডাকবে, অন্য কাউকে নয়; কেবল তাঁর কাছেই নৈকট্য কামনা করবে, অন্য কারো কাছে নয়। মূলত তারা তাঁকেই ডাকে আর তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেন। তারা তাঁরই নিকট এগিয়ে আসে আর তিনি তাদের কাছে টেনে নেন।

মহান আল্লাহ কিছু মুশরিক জাতির নিন্দা করেছেন, যারা তাঁর সাথে অন্য কাউকে আহ্বান করেছে এবং তাঁর সাথে অংশীদার স্থাপন করেছে। এই কর্ম তাদের কোনো উপকারে আসেনি, কারণ তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে অসীলা তলব করলেও তাদের এই পথ ছিল চরম পর্যায়ের ভ্রষ্টতাপূর্ণ। তাদের প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, ‘জেনে রেখো, আল্লাহর জন্যই বিশুদ্ধ ইবাদত-আনুগত্য। আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে তারা বলে, আমরা কেবল এজন্যই তাদের ইবাদত করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে। যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে, আল্লাহ নিশ্চয় সে ব্যাপারে তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। যে মিথ্যাবাদী কাফের, নিশ্চয় আল্লাহ তাকে হেদায়াত দেন না’ *(আয-যুমার, ৩৯/৩)*।

তাদের নিকটে আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রধান মাধ্যম হলো শিরক, যা তাদের কোনো উপকারে আসেনি; বরং আল্লাহ তাদের মিথ্যাবাদী বলেছেন এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ কারণেই মহান আল্লাহ তাঁর ইবাদতের সঠিক পথ ও পদ্ধতি স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘আর যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, আমি তো নিশ্চয় নিকটবর্তী। আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই, যখন সে আমাকে ডাকে’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৬)*। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ অদৃশ্য এবং অতি গোপন বিষয়ও জানেন, আসমান ও যমীনের কোনো কিছুই তাঁর কাছে গোপন নয়। তিনি ভাষার পার্থক্য ও প্রয়োজনের ভিন্নতা সত্ত্বেও সব কণ্ঠের আওয়াজ শোনেন। এতে একসাথে একাধিক বান্দার আবেদন শ্রবণ কোনো সমস্যার তৈরি করে না, বান্দার কোনো চাওয়াই তাঁকে বিভ্রান্ত করে না এবং বান্দার বারবার চাওয়ার কারণে তিনি বিরক্তিবোধও করেন না।

بارَكَ اللهُ لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإيَّاكم بما فيه من الآيات والذِّكْر الحكيم.

দ্বিতীয় খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহাপরাক্রমশালী ও প্রশংসিত, যিনি পরম দয়ালু ও স্নেহময়। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নেতা ও নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি, যিনি হাউযে কাউছারের মালিক হবেন এবং যার হাতে থাকবে সম্মানের পতাকা।

অতঃপর, হে আল্লাহর বান্দারা! রাসূলগণের সর্দার নবী ﷺ পরিষ্কারভাবে দ্বীনের বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন, এর মাধ্যমে আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টির উপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য প্রয়োজনীয় কোনো কিছুই গোপন রাখেননি, বরং সবকিছুই স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। তিনি ﷺ বলেছেন, ‘তোমরা যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারবে, এমন সবকিছুই আমি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছি’।[৫] তাই আল্লাহর নৈকট্য পেতে হলে তিনি তাঁর কিতাবে যে নির্দেশনা দিয়েছেন কিংবা রাসূল ﷺ এ বিষয়ে যা বর্ণনা করেছেন সেই অনুযায়ী আমল করতে হবে এবং তা ইখলাছের সাথে করতে হবে। এর বাইরে ভিন্ন পন্থায় তার নৈকট্য লাভ করতে চাইলে তা প্রত্যাখ্যাত হবে এবং তা বান্দাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করার পরিবর্তে আরো দূরবর্তী করে দিবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘যে কেউ এরূপ আমল করে যা আমাদের শরীআতের পরিপন্থি, তা পরিত্যাজ্য’।[৬]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম হলো, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল বিষয়ে সুন্নাহর অনুসরণ করা। সর্বদা আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল থাকা। সকল কথা ও কাজে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা। উক্ত তিনটি মাধ্যম ব্যতীত কেউ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারেনি। তারাই কেবল আল্লাহর নৈকট্য লাভে ব্যর্থ হয়েছে, যারা এ তিনটির কোনো একটি বা সবগুলো থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছে।

হে আল্লাহ! আমরা আপনার নৈকট্য চাই, আপনার সাথে মুনাজাতে তৃপ্ত হতে চাই। আপনার যিকির, শুকরিয়া ও ইবাদতের উপর অটল থাকার জন্য সাহায্য চাই।

---

৫. ত্বাবারানী, হা/১৬৪৭; সিলসিলা ছহীহা, হা/২৩২।
৬. ছহীহ বুখারী, হা/২১৪২।

ইসলামে বৃক্ষ

-শফিক নোমানী*

আল্লাহ তাআলা পৃথিবীকে অপরূপ সৌন্দর্যময় করে সৃষ্টি করেছেন। গাছগাছালি, বৃক্ষ-তরুলতা এই সৃষ্টিকে অনিন্দ্য করে তুলেছে। সবুজ পাতায় ছেয়ে থাকা বৃক্ষ প্রাণে শিহরণ জাগায়। ঝিরঝির হিমেল বাতাসে দেহ-মন জুড়িয়ে যায়। গাছের সঙ্গে মানুষের জীবনযাপন ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

গাছ থেকে আমরা অক্সিজেন পাই। সেই অক্সিজেন গ্রহণ করে আমরা বেঁচে থাকি। গবেষকদের মতে, একটি গাছ বছরে প্রায় ১০ থেকে ৪০ কেজি অর্থাৎ গড়ে প্রায় ২৫ কেজি কার্বনডাই অক্সাইড গ্রহণ করে। গাছপালা ও বৃক্ষ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। চারদিক সজীব-সতেজ ও স্বাভাবিক রাখে। দূষণমুক্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ মানবজাতির জন্য অত্যন্ত জরুরী।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বনভূমি থাকার দরকার ২৫ শতাংশ, বর্তমানে আছে প্রায় ১৬ শতাংশ, বনভূমি কম রয়েছে ৯ শতাংশ।[১]

গাছপালা প্রকৃতির সৌন্দর্য: আল্লাহ তাআলা ফলবান গাছপালা ও সবুজ-শ্যামল বৃক্ষরাজি সৃষ্টি করেছেন। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে, ﴿يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ‘তোমাদের জন্য পানির সাহায্যে তিনি উৎপন্ন করেন শস্য, যায়তুন, খেজুর, আঙুর এবং সব ধরনের ফল-ফলাদি। নিশ্চয়ই এসবের মধ্যে নিদর্শন রয়েছে, তাদের জন্য, যারা চিন্তা-গবেষণা করে’ *(আন-নাহল, ১৬/১১)*।

মূলত এসব কিছু মানুষের প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ হিসেবে তৈরি করেছেন। এছাড়াও কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির কিছু দৃশ্য মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়েছে, যেন সব কিছু দেখে মানুষ আল্লাহর শক্তিমত্তার কথা স্মরণ করে।

গাছপালা মহান আল্লাহর অপার নেয়ামত। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে তা প্রতীয়মান হয়। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ﴾ ‘তারা কি লক্ষ করে না, নিশ্চয়ই আমরা ঊষর ভূমির ওপর পানি প্রবাহিত করে তার সাহায্যে উদ্গত করি শস্য, যা থেকে তাদের গবাদি পশু এবং তারা নিজেরা আহার গ্রহণ করে?’ *(আস-সাজদা, ৩২/২৭)*।

গাছ আল্লাহকে সিজদা দেয়: আল্লাহ তাআলাকে গাছগাছালি ও বৃক্ষরাজি সিজদা করে। তাঁর তাসবীহ পাঠ ও পবিত্রতা বর্ণনা করে। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ﴾ ‘আপনি কি দেখেননি, নিশ্চয়ই আল্লাহকে সিজদা করে নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পর্বতমালা, বৃক্ষরাজি ও জীবজন্তু এবং বহু মানুষ?’ *(আল-হাজ্জ, ২২/১৮)*।

বৃক্ষরোপণে নবী করীম ﷺ-এর উদ্দীপনা: রাসূলুল্লাহ ﷺ গাছ লাগাতে উৎসাহিত করেছেন, যাতে উদ্ভিদ বৃদ্ধি পায় ও পরিবেশ সুস্থ হয় ও বিশ্ব মানবতার জন্য বাসযোগ্য থাকে। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ ‘যদি কোনো মুসলিম কোনো গাছ রোপণ করে অথবা ক্ষেতে ফসল বুনে, আর তা থেকে কোনো পাখি কিংবা মানুষ বা কোনো চতুষ্পদ প্রাণী খায়, তাহলে তা তাঁর জন্য ছাদাক্বা হিসেবে গণ্য হবে’।[২]

বৃক্ষরোপণের ফযীলত: বৃক্ষরোপণ ও গাছ লাগানোর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে যথার্থ মূল্যায়ন পাওয়া যায়। বৃক্ষরোপণ ইবাদত ও নেক আমল হিসেবে গণ্য। বান্দার লালন-পালনে বেড়ে ওঠা বৃক্ষ থেকে সৃষ্টিজীবের কেউ কিছু খেলেই বা একটু উপকৃত হলেই ছওয়াব লেখা হয় তার আমলনামায়। রোপণকারী ব্যক্তির মৃত্যু হলেও তা ছাদাক্বায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হবে। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا ‘যদি ক্বিয়ামত সংঘটিত হয়, আর তোমাদের কারো হাতে একটি গাছের চারা থাকে, তবে যদি সে পারে ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আগে তা রোপণ করতে, তবে সে যেন সেই চারাটি রোপণ করে’।[৩]

প্রয়োজন ছাড়া গাছকাটা নিষিদ্ধ: পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য গাছের ভূমিকা অপরিহার্য। তাই অপ্রয়োজনে বৃক্ষনিধন করা ঠিক নয়।

প্রয়োজনে গাছকাটা যায়: পরিবেশ ও স্থানের জন্য ক্ষতিকর অথবা মানুষের চলাচলে কষ্ট হয় অথবা যে-কোনো প্রয়োজনে গাছ কাটলে কোনো অসুবিধা নেই। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, ‘আমি এক ব্যক্তিকে দেখেছি জান্নাতে সে ঐ গাছের ছায়ায় চলাচল করছে, যে গাছটি সে রাস্তার মোড় থেকে কেটেছিল। গাছটি মানুষকে কষ্ট দিত’।[৪]

শেষ কথা: বৃক্ষরোপণ ও গাছ লাগানোর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করা যায়। বৃক্ষরোপণ ইবাদত ও ছাদাক্বায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য। গাছগাছালি আমাদের সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশের জন্য অত্যন্ত জরুরী উপাদান।

অপ্রয়োজনে গাছ না কেটে, প্রচুর (অন্তত বছরে একটা করে হলেও) বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ গ্রহণ করা আমাদের উচিত। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

* অধ্যয়নরত, মাথিয়া ই.ইউ. ফাজিল (স্নাতক) মাদরাসা, কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ।

১. উইকিপিডিয়া।

২. ছহীহ বুখারী, হা/২৩২০; ছহীহ মুসলিম, হা/৪০৫৫।

৩. আদাবুল মুফরাদ, হা/৪৭৯; মুসনাদে আহমাদ, ৩/১৮৩, ‘ছহীহ’।

৪. ছহীহ মুসলিম, হা/৫৮৩৭।

আলোর সন্ধানে!

*-মো. কায়সার আলম**

আমরা দুনিয়ার মোহে অন্ধ। এই মোহ শেষ না হতেই যদি মৃত্যু এসে ডাক দেয়, আদৌও কি পরকালের জন্য কিছু করলাম? এই চিন্তায় যখন মন অস্থির হয়ে যাবে। মালাকুল মউত এসে জান ক্বব্য করা শুরু করবেন। যন্ত্রণায় দেহ ছটফট করবে। প্রিয়জনদের অশ্রুজল বুকের উপর পড়তে থাকবে, তারপর যখন রূহ কণ্ঠনালিতে পৌঁছে যাবে, আশেপাশে সব অন্ধকারে ছেয়ে যাবে, তখনই মনে হতে থাকবে এই বুঝি এই মিথ্যা জগতের শেষ সময়।

আদৌ কি কোনো কাজে আসবে তখন অর্থ, বিত্ত, দাম্ভিকতা, অহংকার?

স্বল্প জীবনের দুনিয়ার মোহ তখনই হয়ে উঠবে সবচেয়ে বড় বিপদ। আল্লাহর হুকুম ভুলে ইয়াহূদীদের সাজানো জীবন পরিচালনাই হয়ে উঠবে তখন সবচেয়ে বড় বিপদ। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠতেই পারে, ইয়াহূদীদের সাজানো জীবনপদ্ধতি কেমন? তাহলে আসুন! সে সম্পর্কেই জানি আজ।

আমাদের দৈনন্দিন চলাফেরা, আশেপাশের স্কুল-কলেজ, ব্যাংক, অফিসগুলো পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে যে হারাম পন্থা অবলম্বনে পরিচালিত সবই যেন ইয়াহূদীদেরই সাজানো একেকটি পদ্ধতি। বর্তমান সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনেও এর প্রভাব ব্যাপক। মূলত ইয়াহূদীরা আমাদের থেকে গুরুত্বপূর্ণ সব সম্বল এমনভাবে আলাদা করে নিচ্ছে, যেন কেবল তারাই সত্য। সবদিক থেকে আমাদের অধিকার, ঈমান, স্বাস্থ্য সব নিয়েই যেন টানাটানি করছে অনেকটা চালাকির সাথে।

তারপর এই অধিক মূল্যবান সম্পদগুলো বুদ্ধিমত্তার সাথে ছিনিয়ে নিয়ে তারা আমাদের দিল তথাকথিত আধুনিকতার ছোঁয়া। এখন আমাদের ভাষ্যমতে, আমাদের সময় কাটানোর জন্য রিলস আছে, রাত ২-৩টার আগে ঘুমই আসে না, শুধু ফেসবুক স্ক্রল করতে ভালো লাগে, আমাদের সবকিছুর স্বাধীনতা আছে, সকালে ১০-১২টায় ঘুম থেকে উঠব। খেয়েদেয়ে আড্ডাবাজি করে চলে যাবে দিন। না হয় একটু কলেজ গেলাম, বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিলাম, ক্লাস ১-২টা করলে করলাম, না করলে নাই। কারণ আমাদের সবকিছুর স্বাধীনতা আছে।

এই স্বাধীনতার জন্যই কি তাহলে আমাদের রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাথরের আঘাতের শিকার হয়েছিলেন?

স্টোরিতে এখন যুবকেরা ইসলামী ভিডিও দেয়, ব্যাকগ্রাউন্ডে গান দিয়ে। স্কুলে শিক্ষক অভিভাবককে বলে, আপনার মেয়ে তো ভালো নাচতে জানে, মাশা-আল্লাহ! এখন এই তথাকথিত শিক্ষিত শিক্ষককে কে বুঝাবে মাশা-আল্লাহ নয়; আস্তাগফিরুল্লাহ পড়তে হবে ওখানে।

যখন আপনি মানুষকে দেখবেন, ব্যাকগ্রাউন্ডে মিউজিক দিয়ে ইসলামী ভিডিও দিচ্ছে, তখন বুঝতে পারবেন, এটা তারই অংশ। স্কুল-কলেজগুলোতে ছেলে-মেয়েদের বন্ধুত্ব একদম স্বাভাবিক বলেই বিবেচনায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আপনি সূদ পছন্দ না করলেও ব্যাংকিং সিস্টেম এমনভাবে করা হয়েছে যে, আপনি ব্যাংক থেকে দূরে থাকতে না পারলে কোনো না কোনোভাবে সূদের জালে আটকে যাচ্ছেন।

মা-বাবা তাদের মেয়েদের অনেক সময় বলে থাকেন, আরে দুলাভাই-ই তো একটু মশকরা করছে, আরে তোমার তালতো ভাই এসেছে, কথা বলে যাও। এগুলা মা-বাবাই বলে, অথচ এটা কত বড় ফেতনা তা তারা বুঝে না। মা-বাবাও চায় তাদের মেয়ে ফেতনা থেকে দূরে থাকুক, কিন্তু ফেতনাকে তারা এমনভাবে আমাদের কাছে স্বাভাবিক বিষয় বলে মাথায় ঢুকিয়ে দিল যে, তারা বুঝতেই পারে না পরিবারের সদস্যরা কী করছে।

তারপর রইল গায়রত। গায়রত শব্দটাই যেন ভারী অলংকারে ভরপুর একটি শব্দের মতো। গায়রত মুমিনদের অলংকার।

গায়রত কী? গায়রত হলো নিজের পরিবারের মেয়েদের সর্বোচ্চ সম্মানের চোখে দেখা এবং মেয়েরাও নিজেদের সম্মানিত ব্যক্তিত্ব মনে করে বেগানা পুরুষদের নযর থেকে নিজেদের রক্ষা করা। বর্তমানে আধুনিক স্বামীদের দেখা যায়, বিয়ের পর স্ত্রীর ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় না দিলে যেন বিয়ের পূর্ণতাই পায় না (আস্তাগফিরুল্লাহ)।

মানুষ কতটা আত্মমর্যাদাহীন হলে নিজের স্ত্রীর ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় সবার দেখার পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়! গায়রত সম্পর্কে আরও ভালো করে বুঝার জন্য দুটি ঘটনা বলি।

ঘটনা-১:

একদিন মক্কার এক মুশরিক তার উট যবেহ করছিল। তাকে উটটি যবেহ করার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে সে উত্তর দিল, 'এই উটটির উপর আমার পরিবারের মহিলারা বসত; বিক্রি করে দিলে এই উটে অন্য পুরুষ বসবে, তা আমার সহ্য হবে না'। একজন মুশরিকের আত্মমর্যাদা এমন হলে, আপনি একজন মুসলিম হয়েও কীসের নেশায় আজ পথভ্রষ্ট? প্রশ্নটা নিজেকেই করুন।

* ইসলামপুর, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।

ঘটনা-২:

একদিন এক ব্যক্তি আবূ তালেবকে প্রশ্ন করল, 'আপনার স্ত্রী কেমন আছেন?' প্রশ্ন শুনে আবূ তালেব বললেন, 'যদি তোমার রক্ত হালাল হতো, তাহলে তরবারি দিয়ে আমি তোমার মাথা কেটে ফেলতাম'। এটাই গায়রত।

গায়রতহীনতা আপনাকে দাইয়্যূছ করে তুলবে আর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'দাইয়্যূছ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।

ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তাদের প্রতি আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তাকিয়েও দেখবেন না; পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারিণী মহিলা এবং দাইয়্যূছ পুরুষ (যে তার স্ত্রী, কন্যা ও বোনের নোংরামিতে চুপ থাকে এবং বাধা দেয় না)'।[১]

অর্থাৎ যে পুরুষ তার স্ত্রী, বোন ও মেয়েকে অশালীনভাবে চলাচল থেকে বাধা দেয় না।

আর বর্তমান সমাজের পুরুষেরা বাধা দেওয়া তো দূরের কথা, উল্টা নিজেরাই তাদের স্ত্রীর ছবি ফেসবুকে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দেয়। নিজের মায়ের ছবি, কন্যার ছবি নিজেরাই সোশ্যাল মিডিয়ায় সবার সামনে প্রকাশ করে দেয়। এটাই বর্তমান শিক্ষার কুফল।

এক সময় মানুষ দীর্ঘ সময় পড়ার মধ্যে মন দিতে পারত; কিন্তু ফেসবুক, ইউটিউব, টিকটক, ইনস্টাগ্রামের স্বল্প সময়ের রিলসগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে, আপনি ওগুলো দেখতে দেখতে তার মধ্যেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা হারিয়ে যাবেন। কোনো জায়গায় দীর্ঘক্ষণ সময় দিতে আপনার মন চাইবে না। আপনি ১০ মিনিটের একটা শিক্ষামূলক ভিডিও পুরো দেখতে চাইলেও ৩ বার স্ক্রল করার কথা ভাববেন।

আন্তর্জাতিক খেলার গভীরে কী পরিমাণ মদ, জুয়া, বেহায়াপনা আছে, সেটা জেনেও রাত ৩-৪টা পর্যন্ত জেগে থাকতে আপনাকে বাধ্য করে। এই খেলার জন্য মুসলিমরা খুব ভোরে নিমেষেই উঠে যায়, কিন্তু ফজরের ছালাতের জন্য তারা উঠতে পারে না!

বন্ধু/বান্ধবীর জন্মদিনে না গেলে তারা মন খারাপ করবে, সেটা আমাদের মাথায় ঢুকানো হয়েছে। ওভাবেই মস্তিষ্কটা ধুয়ে দিল; অথচ জন্মদিনে গেলে যে আল্লাহর বিরোধিতা হবে, সে খেয়ালটা আমাদের মাথায় নেই।

এই দাজ্জালের অনুসারীরা আমাদের মন খারাপের ঔষধ দিয়েছে ফ্রি মিক্সিং অর্থাৎ বিয়ে কঠিন, যেনা সহজ; অথচ একদম যাবজ্জীবন একসাথে থাকার জন্য ইসলাম বিয়েকে সহজ করে দিয়েছে।

তারপর তারা আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিল, নারী-পুরুষ বন্ধু হতেই পারে, বন্ধুর সাথে দেখা করতেই পারে, ক্যাফেতে বসতেই পারে। কিন্তু ইসলামে এগুলো স্পষ্ট হারাম বলে বিবেচিত, এটা আমাদের মাথায় থেকেও যেন নাই। এগুলোতে যোগ দিতে না পারলেই এখন মন খারাপ হয়। আপনার কোনো বান্ধবী ফেসবুকে ছবি দিচ্ছে, আপনি দিতে পারছেন না, তাই আপনার খারাপ লাগছে।

ছেলে-মেয়ে একসাথে অনুষ্ঠানে আড্ডা দিচ্ছে, আপনি পারছেন না, কোনো না কোনো কারণে এগুলোর জন্য যদি আপনি মনে কষ্ট পান, তাহলে বুঝবেন, এখনো আপনি শয়তানের ধোঁকায় পড়ে আছেন।

যখন সেই বিষয়গুলোকে অগ্রহণযোগ্য বিষয় হিসেবে নিতে পারবেন, তখনই পুরোপুরি মুক্ত হয়ে এই চক্রান্ত থেকে বের হতে পারবেন।

যাদের খুশি করার জন্য আজ আপনি দুনিয়ার মোহে অন্ধ হয়ে আছেন, পরকালে কি আদৌ তারা আপনার পাশে এসে দাঁড়াবে?

পরকালে নিজের মা-বাবাও সন্তানদের দেখে পালাতে থাকবে। জন্মদাতা, জন্মদাত্রী মা-বাবাকে দেখে সন্তানরা পালাতে থাকবে। সেদিন কি আদৌ এই তথাকথিত আধুনিক সমাজব্যবস্থার কর্ণধাররা, যারা আপনার চিন্তাভাবনা নিয়ে খেলছে, তারা আপনার কাজে আসবে? নাকি যাদের দেখানোর জন্য, যাদেরকে খুশি করার জন্য এই বিধর্মীদের মতো সমাজব্যবস্থায় নিজেকে মগ্ন রেখেছেন, তারা আপনার পাশে সাহায্যের জন্য ছুটে আসবে?

মনে রাখবেন! আমার প্রিয় ভাইয়েরা, আল্লাহর কসম! ঐদিন শুধু কাজে আসবে ঈমান। উপকারে আসবে নেক আমল, সুন্দর ব্যবহার এবং একটি আদর্শ জীবন। যে আদর্শ জীবনে থাকবে ছোট ছোট কিছু আমল, যা আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে বিপুল আকারে বেড়ে যাবে। তখন শুধু কাজে আসবে উত্তম ব্যবহার। তখন কাজে আসবে মুয়াজ্জিনের 'হাইয়া আলাছ ছালাহ' ডাকটা গুরুত্ব সহকারে নেওয়া। তখন কাজে আসবে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া মেয়ে দেখে চোখ নিচে নামিয়ে চলা। তখন কাজে আসবে গায়রত রক্ষা। তখন কাজে আসবে ছোট ছোট কিছু উপদেশ, যা মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। তখন কাজে আসবে মানুষের জন্য কিছু কাজ, যা মানুষের জীবনে কিছু সুন্দর মুহূর্ত তৈরি করে। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন এবং সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!

১. নাসাঈ, হা/২৫৬২।

সম্পত্তিতে নারীর অধিকার

*-রাকিব আলী**

মানুষের কল্যাণের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত অনেক বিধানের রহস্য আমরা বুঝে উঠতে পারি না। সৃষ্টি হিসেবে এটাই স্বাভাবিক। সৃষ্টি হয়ে যদি সবকিছু বুঝে ফেলা যায়, তাহলে সৃষ্টি আর সৃষ্টিকর্তার পার্থক্য থাকলো কোথায়? অনেক সময় আল্লাহর বিধানের রহস্য না বুঝে আমরা সেটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলি; এমন কাজ করে ফেলি, যা রীতিমতো ঈমানকে ধ্বংস করে দেয়। অথচ আল্লাহর বিধান নিয়ে ইতিবাচকভাবে চিন্তা করলে দেখবেন এমন অনেক কিছু বুঝতে পারা যায়, যা ঈমান বৃদ্ধিতে খুবই সহায়ক। তেমনি একটি বিধান হচ্ছে 'মীরাছ'-সংক্রান্ত বিধান। আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক ছেলের জন্য দুই মেয়ের অংশের সমপরিমাণ *(আন-নিসা, ৪/১১)*।

আপাতদৃষ্টিতে, এই আয়াতটিতে মেয়েদেরকে ছেলেদের তুলনায় কম সম্পত্তি দেওয়া হয়েছে মনে হলেও আসলে কম দেওয়া হয়নি। যদি আপনি আয়াতটি তথা আল্লাহর এই বিধান নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেন, তবে আপনি অশ্রুসিক্ত হতে বাধ্য। কারণ তখন আপনি আল্লাহর অসীম দয়া ও ভালোবাসা টের পাবেন। আল্লাহর ইনছাফ নিয়ে আপনার মনে একটুও সন্দেহ থাকবে না। তখন আল্লাহকে ডেকে বলবেন, হে আমার মালিক! আমি বড় যালেম, তুমি বড় দয়ালু, তুমি বড় ইনছাফকারী।

আচ্ছা! মনে করুন, আপনার ছোট ভাইকে নিয়ে আপনার নানাবাড়িতে ঘুরে আসার জন্য আপনার বাবা আপনাকে ২০০ টাকা হাতে ধরিয়ে দিলেন। এখন ২০০ টাকা দিয়ে আপনাকে বললেন এখান থেকে তুমি রিকশায় যাওয়া-আসার খরচ বহন করো, তোমার ভাইকে কিছু কিনে দিয়ো ইত্যাদি।

অপরদিকে, আপনার বাবা তার ছোট ছেলেকে ১০০ টাকা গুজিয়ে দিয়ে বললেন, এই নাও, এটা তুমি রেখে দাও।

এখন আপনি যাওয়ার পথে আপনার বাবার কথামতো রিকশা ভাড়া দিলেন, ভাইকে আইসক্রিম কিনে দিলেন। তারপর আসার সময় রিকশা ভাড়া দিলেন। সবকিছু খরচ করার পর দেখা গেল যে, উভয়ের কাছে সমপরিমাণ টাকা অবশিষ্ট রয়ে গেছে।

আপাতদৃষ্টিতে আপনার ভাগটা বড় মনে হলেও আসলে আপনার ভাইয়ের ভাগটা কম ছিল না। যেহেতু তার সকল খরচ আপনার কাঁধে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই তার প্রতি বেইনছাফ হয়েছে—এমনটি বলার আদৌ কোনো সুযোগ নেই।

একজন পুরুষকে একভাগ সম্পদ দিয়ে আল্লাহ তাকে বলেছেন তুমি নারীকে বিয়ের সময় মোহরানা দিয়ো, বিয়ের খরচ তুমি বহন করো, তাকে কাপড়চোপড়, খাবারদাবার, চিকিৎসা, ওষুধপত্র, প্রসাধনীসহ সকল প্রয়োজনীয় কিছু অর্থাৎ তার সকল ভরণপোষণ তুমি চালিয়ে নিয়ো। আর এখানেই শেষ নয়। তার সন্তান গর্ভধারণ থেকে শুরু করে, তার কাপড়চোপড়, খাবারদাবার, চিকিৎসা, পড়াশোনার খরচ তথা ভরণপোষণ তুমি পুরুষ চালিয়ে নিয়ো।

দেখেছেন, কত দায়িত্ব? সে বেচারা দায়িত্ব পালন করতে করতে দেখা যায় তার বড় ভাগটা নারীর ঐ ছোট ভাগ থেকেও আরও ছোট হয়ে যায়। এখন আপনিই বলুন, তাকে যদি বেশি দেওয়া না হয়, তাহলে সে এত খরচ বহন করবে কীভাবে? এই ব্যাপারটি কি কখনো আপনি ভেবে দেখেছেন? এর বিপরীতে নারীকে কি কোনো খরচ করতে বলা হয়েছে? একটি পয়সাও না। তাকে যা দেওয়া হয়েছে, সে তা স্বাধীনমতো খরচ করতে পারবে। এখানে কোনো পুরুষ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। পুরুষের হস্তক্ষেপ করা মানে সে বাড়াবাড়ি ও যুলম করল।

ঐ বাবা যেমন তার এক ছেলেকে আরেক ছেলের তুলনায় অর্ধেক দিয়ে তাকে ঠকাননি। ঠিক একইভাবে, রহমানুর রহীম নারীকে পুরুষের অর্ধেক দিয়েও তাকে মোটেও ঠকাননি। বরং আপনি চিন্তা করলে দেখবেন এটাই তার জন্য যথাযথ পাওনা। কারণ নারীর সকল খরচের দায়িত্ব পুরুষের কাঁধে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এখানে সমান দেওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। সুতরাং যারা বলে, 'নারীকে সমান না দিয়ে ঠকানো হয়েছে' নিশ্চয়ই তারা অবিবেচক ছাড়া আর কিছুই নয়!

বড় কষ্ট হয়, যখন তথাকথিত নারীবাদীরা এখানে এসে সমান অধিকারের নামে ইনছাফের প্রশ্ন তুলে। আরে! অধিকার যদি সমান হয়, তাহলে দায়িত্বটাও সমান হতে হবে। এই যে আপনি ১০ মাসের অধিক সময় ধরে সন্তান গর্ভধারণ করছেন। এই দায়িত্বের অর্ধেক কি পুরুষকে দেওয়া সম্ভব? এই যে আপনি দুবছর সন্তানকে কষ্ট করে স্তন্যপান করাচ্ছেন, এই দায়িত্বের অর্ধেক কি পুরুষকে দেওয়া সম্ভব? একইভাবে, পুরুষ বিয়ের সময় মোহর দিচ্ছে, আপনি কি তাকে মোহরের মতো কিছু দিবেন? তার ওপর আপনার ভরণপোষণের দায়িত্ব রয়েছে। মাতৃত্ব সামলে আপনি কি তার ভরণপোষণের দায়িত্ব নিবেন? এসব দায়িত্ব সমানভাবে যেমন ভাগাভাগি করা সম্ভব নয়, তেমনি অধিকারও সমানভাবে ভাগ করা সম্ভব নয়। এসব দায়িত্ব যদি সমান সমান করা যায়, কেবল তখন সমান অধিকারের প্রশ্ন আসবে, তার আগে প্রশ্ন তোলাও অযৌক্তিক।

* আম্বরখানা, সিলেট।

সমান অধিকারের প্রশ্ন তখন আসবে, যখন দায়িত্ব সমান হবে। যেখানে দায়িত্ব সমান নয়, সেখানে সমান অধিকারের প্রশ্ন তোলা একেবারেই অমূলক। দায়িত্ব সমান নয় এমন জায়গায় সমান অধিকার দেওয়া মানে একজনের ওপর যুলম করা। **এজন্য কথাটি 'সমান অধিকার' নয়; 'ন্যায্য অধিকার' হওয়া উচিত।** যার যতটুকু পাওয়ার কথা সে ততটুকু পাবে, সে তার পাওনার ক্ষেত্রে কম পেয়ে যুলমের শিকার না হলেই হলো।

যদি আপনি সমান অধিকারের কথা বলেন, তাহলে আমি নিশ্চিত আপনি বুঝেশুনে নিজের জ্ঞান খাটিয়ে বলেননি। চিন্তা করে বললে আপনি সমান অধিকারের কথা বলতে পারতেন না, বরং ন্যায্য অধিকার বলতেন। আপনি তথাকথিত নারীবাদীদের টোপ গিলেছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

যখন আপনি সমান অধিকারের কথা বলছেন, তখন আপনি মূলত কী বলছেন, জানেন? আপনি বলছেন, আপনি যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের সিইও হন, তবে আপনার আর আপনার কর্মচারীর বেতন সমান হতে হবে। কী, পারবেন সেটা মেনে নিতে? তখন তো ঠিকই আপনি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠবেন। তখন তো ঠিকই গলা ফাটিয়ে বলবেন, তার দায়িত্ব আর আমার দায়িত্ব কি সমান? এই ভিন্নতা যদি আপনি বুঝতে পারেন, তবে নারী-পুরুষের অধিকারের ভিন্নতা কেন বুঝতে পারবেন না?

এদের দায়িত্ব সমান না হওয়ায় তাদের অধিকার সমান না হওয়াটা যদি যৌক্তিক হয়, ইনছাফ হয়, তাহলে ঠিক একইভাবে নারী ও পুরুষের দায়িত্ব সমান না হওয়ায় তাদের অধিকার সমান না হওয়াটা কেন যৌক্তিক হবে না, কেন ইনছাফ হবে না? আপনার যে মস্তিষ্ক ঐ মালিক-কর্মচারীর অধিকারের ভিন্নতা বুঝতে সক্ষম, সেই একই মস্তিষ্ক নারী-পুরুষের অধিকারের ভিন্নতা বুঝতে অক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছে কেন?

হায় আফসোস! নারীদের প্রতি আল্লাহ কতটা দয়া করেছেন, ইনছাফ করেছেন সেটা যদি তারা প্রকৃত অর্থে বুঝতে পারত, তাহলে তারা রবের শুকরিয়ায় মস্তক অবনত করত।

কারণ আল্লাহ তাদেরকে যে অংশ দিয়েছেন, সেখান থেকে তাদেরকে কোনো খরচের দায়িত্ব দেননি, পুরুষের মতো আলাদা করে কারও কোনো দায়িত্ব বহনেরও কথা বলেননি। তাদের দায়িত্ব পুরুষের কাঁধে দিয়ে তাদেরকে বরং ভারমুক্ত রেখেছেন।

এ সমাজের কিছু পুরুষ নারীদের প্রাপ্য অধিকার ঠিকমতো দেয় না—এটা স্রেফ তাদের দোষ। এজন্য তাদেরকে একদিন কঠিন বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। তাই বলে আপনি আল্লাহর বিধানকে দোষ দিতে পারেন না। আল্লাহর বণ্টনে নাখোশ থাকতে পারেন না। আল্লাহ তো আপনাকে বঞ্চিত করেননি। অপরদিকে, অন্য কোনো ধর্মে বাবার সম্পত্তিতে নারীদেরকে কোনো অধিকারই দেওয়া হয় না। সেই জায়গায় ইসলাম আপনাকে কত সম্মানিত করেছে। এই সম্মান বুঝতে না পারা সত্যিই অনেক বড় দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। আর একজন মুমিনা কখনোই দুর্ভাগা হতে চাইবে না। মহান আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!

'জাতির অধঃপতনের পাঁচ সিঁড়ি' প্রবন্ধটির বাকী অংশ

(৪) অঙ্গীকার ভঙ্গ করা: অঙ্গীকার ভঙ্গ করা নিফাক্বের আলামত। কুরআন মাজীদের সূরা আল-মায়েদায় অঙ্গীকার পূরণের জোরালো তাগিদ এসেছে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এখানে অঙ্গীকার বলতে আল্লাহ তাআলা বান্দার কাছ থেকে ঈমান ও ইবাদত সম্পর্কিত যেসব অঙ্গীকার নিয়েছেন, সেটা অথবা তাঁর নাযিলকৃত বিধিবিধান, হালাল ও হারাম সম্পর্কিত যেসব অঙ্গীকার নিয়েছেন, আয়াতে সেগুলো উদ্দেশ্য' *(তাফসীরে মা'রেফুল কুরআন, আল-মায়েদা, ৫/১-এর তাফসীর দ্রষ্টব্য)*।

(৫) শরীআত বহির্ভূত বিচারব্যবস্থা: যমীন আল্লাহ তাআলার আর এখানে শাসনব্যবস্থা চলবে তাঁরই নির্দেশিত পন্থায়। নিজেদের মনগড়া সংবিধান মোতাবেক তাঁর যমীনে বিচারকার্য চলতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ﴾ 'বলুন, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট থেকে পাওয়া এক সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত; অথচ তোমরা তা মিথ্যা মনে করেছ, যা তোমরা খুব তাড়াতাড়ি পেতে চাও (অর্থাৎ আল্লাহর আযাব) তা আমার আয়ত্তে নেই। হুকুম বা ফয়সালার কর্তৃত্ব কেবল আল্লাহর জন্যই। তিনিই সত্য কথা বর্ণনা করেন আর তিনিই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী' *(আল-আনআম, ৬/৫৭)*। আল্লাহর বিধান বহির্ভূত বিচারব্যবস্থার ব্যাপারে হাদীছে বলা হয়েছে, 'তোমাদের শাসকবর্গ যখন আল্লাহর কিতাব মোতাবেক ফয়সালা না করবে এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে বেছে না নিবে, তখন তিনি তাদের পরস্পরের মধ্যে কোন্দল (যুদ্ধ) বাঁধিয়ে দিবেন' *(ইবনু মাজাহ, হা/৪০১৯)*।

একটি জাতির অধঃপতনের জন্য উপর্যুক্ত কারণগুলো বড় ভূমিকা পালন করে। আমাদের উচিত এসব বিষয়গুলো পরিত্যাগ করে একমাত্র মহান আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!

অটোইমিউন ডিজিজ

-মোছা. রহিমা খাতুন*

জন্মের পর থেকে পৃথিবীর বৈচিত্র্যতার সাথে চলতে গিয়ে আমাদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আমাদের খাদ্যাভ্যাসের বিভিন্ন পরিবর্তনের সাথে সাথে অনেক সময় আমাদের শরীর মানিয়ে নিতে পারে না। তখন বিভিন্ন অসুখবিসুখের সম্মুখীন হতে হয়। তেমনি একটি অসুখ হচ্ছে— অটোইমিউন ডিজিজ। আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার জন্য আমাদেরকে শারীরিক সুস্থতার দিকে নযর রাখতে হবে।

রোগটি নিয়ে আলোচনা— (১) অটোইমিউন ডিজিজ কী? (২) উপসর্গ (৩) অটোইমিউন ডিজিজ হওয়ার কারণ? (৪) প্রতিকার (৫) প্রতিরোধ (৬) ভয়াবহতা বা পরিণতি।

(১) অটোইমিউন ডিজিজ কী: প্রত্যেক মানুষের শরীরে প্রাকৃতিকভাবেই রোগ প্রতিরোধ করার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে কিছু সিস্টেম দিয়েছেন, যাকে ইমিউন সিস্টেম বলা হয়। ইমিউন সিস্টেমের কাজ হলো অ্যান্টিবডি নিঃসরণ করে বাইরের শত্রুকে ভেতরে প্রবেশে বাধা দেওয়া। শরীরে কোনো ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া বা ক্ষতিকর রোগজীবাণুর অনুপ্রবেশ ঘটলে সেই ইমিউন সিস্টেম সক্রিয় হয়ে তাদের প্রবেশে বাধা দিয়ে শরীরকে সুরক্ষিত রাখে। কিন্তু শরীর যখন অটোইমিউন ডিজিজে আক্রান্ত হয়, তখন আমাদের ইমিউন সিস্টেম সুস্থ কোষ ও অসুস্থ কোষকে চিহ্নিত করতে পারে না। তখন শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উল্টো শরীরের সুস্থ কোষ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে আক্রমণ করে। বিশ্বে প্রায় ২০০ এর মতো অটোইমিউন ডিজিজ রয়েছে।

(২) উপসর্গ: অটোইমিউন ডিজিজের বৈচিত্র্যতার কারণে চিহ্নিত করা বেশ কঠিন। রোগের ধরন, বয়স, লিঙ্গ, হরমোনের অবস্থা এবং পরিবেশগত কারণে এটি বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেয়। যেমন: ক্লান্তি, জ্বর, অস্বস্তি, পেশি ব্যথা এবং প্রদাহ, জয়েন্টে ব্যথা, বমি বমি ভাব, অতিরিক্ত গ্যাস, কোষ্ঠকাঠিন্য, ঘুমের সমস্যা, ডায়রিয়া, অপ্রত্যাশিত ওজন হ্রাস, ত্বকের ফুসকুড়ি ও খসখসে ত্বক।

(৩) অটোইমিউন ডিজিজ হওয়ার কারণ: অটোইমিউন ডিজিজের নির্দিষ্ট কোনো কারণ নেই। তা সত্ত্বেও বেশ কিছু কারণে এই রোগ হতে পারে। যেমন: ১. পরিবেশগত কারণ ২. বংশগত ৩. দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণ ৪. ধূমপান ৫. হরমোনাল ৬. বয়স ও লিঙ্গ ৭. দীর্ঘদিন পুষ্টির ঘাটতি ৮. অতিরিক্ত চিন্তা ৯. প্রদাহ ১০. ভিটামিন-ডি এবং ওমেগা-৩ ঘাটতি। কেমিক্যাল, কীটনাশক, রাসায়নিক সার, বিভিন্ন ধরনের স্টেরয়েড, অ্যান্টিবায়োটিক।

(৪+৫) প্রতিকার এবং প্রতিরোধ: অটোইমিউন ডিজিজ থেকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হওয়ার কোনো ওষুধ এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। তবে লাইফস্টাইল ও খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করলে অর্থাৎ প্রাকৃতিক ও কেমিক্যালমুক্ত খাবার গ্রহণ করলে স্বাভাবিক জীবনযাপন করা যায় এবং প্রতিরোধ করা যায়। যেমন:

১ সঠিকভাবে ডাইজেশন (হজম)। খাবার সঠিকভাবে হজম না হলে শরীর থেকে দূষিত পদার্থ দূর হয় না ফলে কোলন পরিষ্কার থাকে না। এভাবে দীর্ঘদিন চলতে থাকলে কোলনে সংক্রমণ ঘটে ফলে নানারকম অটোইমিউন ডিজিজে মানুষ আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

২. ছিয়াম রাখা। ছিয়াম রাখলে আমাদের শরীর সঠিকভাবে কাজ করার জন্য সচল হয়। ছিয়াম রাখলে আমাদের দেহ থেকে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া, চর্বি ইত্যাদি দূর হয়।

৩. প্রসেসড ফুড পরিহার করা। শরীরের হজমক্রিয়া সঠিকভাবে সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য এনজাইম দরকার হয়। আমাদের দেহে যে এনজাইম উৎপন্ন হয়, তা প্রাকৃতিক খাবার হজম করার জন্য যথেষ্ট কিন্তু আমরা যখন প্রসেসড খাবার খায়, তখন সেটা হজমের জন্য প্রসেস এনজাইম প্রয়োজন পড়ে, যা দেহ সরবরাহ করতে পারে না। এর ফলে খাদ্য সঠিকভাবে হজম হয় না এবং কোলন পরিষ্কার থাকে না ফলে রোগজীবাণু বাসা বাঁধে।

৪. খাবার খাওয়ার সময় পানি পান না করে খাওয়ার আধাঘণ্টা আগে এবং পরে পান করা উচিত। কারণ খাবার খাওয়ার সময় পানি পান করলে পাকস্থলীতে খাদ্য হজমের জন্য থাকা অ্যাসিড প্রয়োজনের চাইতে বেশি পাতলা হয়ে যায়। যার ফলে খাদ্য সঠিকভাবে দেহ শোষণ করতে পারে না।

৫. খাবার থেকে চিনি পরিহার করা।

৬. ব্যায়াম করা।

৭. স্ট্রেস বা চিন্তা না করা।

৮. কাঁচা শাকসবজি খাওয়া।

৯. ওমেগা-৩ এবং ওমেগা-৬ খাওয়া।

১০. গাট পরিষ্কার রাখা।

১১. ভিটামিন-ডি এর ব্যালেন্স ঠিক রাখা।

(৬) ভয়াবহতা বা পরিণতি: অটোইমিউন ডিজিজ এমন এক ধরনের রোগ, যা থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া যায় না। একবার হয়ে গেলে সেটা থেকে নতুন নতুন অটোইমিউন ডিজিজ হতে থাকে। তাই আমাদের শরীরকে সুস্থ রাখতে উপরিউক্ত বিষয়গুলো মেনে চলা উচিত।

তথ্যসূত্র :

www.bbc.com; Wikipedia; www.britannica.com; www.medicoverhospitals; wikipedia, Dr. Mujibul Haque (সাক্ষাৎকার NTV); Dr. A. R. M. Jamil (functional medicine).

* বিএসসি, অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি অ্যান্ড কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

আত্মশুদ্ধি: ইসলামী জীবনের অপরিহার্য অংশ

-আব্দুল ওয়াদুদ বিন আবূ বকর*

ভূমিকা: মানুষ শুধু দেহ দিয়ে গঠিত নয়, তার দেহের মধ্যে রয়েছে আত্মা। শরীরের রোগ হলে যেমন চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, তেমনি আত্মাও পাপ, কুপ্রবৃত্তি ও খারাপ অভ্যাসে আক্রান্ত হলে তাকে পরিশুদ্ধ করার প্রয়োজন হয়। এই আত্মিক পরিশুদ্ধির পদ্ধতিকেই ইসলামে বলে 'তাযকিয়াতুন নাফস' বা 'আত্মশুদ্ধি'। এটি ইসলামী ব্যক্তিত্ব গঠনেরও অন্যতম প্রধান স্তম্ভ।

আত্মশুদ্ধির পরিচয়: শাব্দিক অর্থ হলো নিজের আত্মাকে গুনাহ থেকে রক্ষা করা। পারিভাষিক অর্থে আত্মাকে পাপ, খারাপ গুণাবলি ও নফসের কুপ্রবৃত্তি থেকে পরিশুদ্ধ করে তাক্বওয়া, ইখলাছ ও আল্লাহভীতি অর্জন করা।

আত্মার রোগ ও চিকিৎসা: আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে দেহ ও আত্মা এই দুটির সমন্বয়ে সৃষ্টি করেছেন। দেহ কোনো রোগে আক্রান্ত হলে সাধারণত আমরা কোনো ডাক্তারের নিকটে গিয়ে বিভিন্ন পরামর্শ ও ওষুধ গ্রহণ করি এবং তা সেবনের পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হই। তেমনি আত্মা কোনো রোগে আক্রান্ত হলে তার জন্য কী দিকনির্দেশনা আছে, চলুন! তা দেখে নেওয়া যাক।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ 'অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করেন এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। যদিও তারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিপতিত ছিল' *(আলে ইমরান, ৩/৬৪)*।

আত্মার পরিশুদ্ধির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা: সুধী পাঠক! আমরা আমাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সেই মহান সত্তা আল্লাহর নামে বিভিন্ন কসম করে থাকি। আল্লাহ তাআলা নিজেই কসম করে বলেন,

﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا - وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا - وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا - وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا - وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا - وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا - وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا - فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا - قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا - وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾

'কসম সূর্যের ও তার কিরণের! কসম চাঁদের! যখন তা সূর্যের অনুগামী হয়। কসম দিবসের! যখন তা সূর্যকে প্রকাশ করে। কসম রাতের! যখন তা সূর্যকে ঢেকে দেয়। কসম আসমানের এবং যিনি তা বানিয়েছেন। কসম যমীনের এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন। কসম নফসের এবং যিনি তা সুষম করেছেন। অতঃপর তিনি তাকে অবহিত করেছেন তার পাপসমূহ ও তার তাক্বওয়া সম্পর্কে। নিঃসন্দেহে সে সফলকাম হয়েছে, যে তাকে পরিশুদ্ধ করেছে এবং সে ব্যর্থ হয়েছে, যে তা (নফস) কলুষিত করেছে' *(আশ-শামস, ৯১/১-১০)*।

উক্ত আয়াতগুলোর মূল বক্তব্য হলো আল্লাহ তাআলা আসমান-যমীন, সূর্য-চন্দ্র, দিন-রাত এবং মানুষের আত্মা সৃষ্টির সাক্ষ্য দিয়ে তার অসীম ক্ষমতা এবং তার ইচ্ছার প্রতিফলনকে তুলে ধরেছেন। এই আয়াতগুলো আত্মশুদ্ধি ও তার পরিণতির ওপর এক বিশেষ গুরুত্ব দেয় এবং সাথে সাথে মানবজীবনের মূল সাফল্য ও ব্যর্থতার মাপকাঠি নির্ধারণ করে দেয় আর তা হলো আত্মার পরিশুদ্ধি।

সারকথা হলো, তাযকিয়াহ বা আত্মশুদ্ধি ছাড়া কোনো মানুষ প্রকৃত সফলতা অর্জন করতে পারে না।

নবী ﷺ বলেছেন, أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ 'সাবধান! শরীরে এমন একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে, যদি তা ঠিক থাকে, তবে সমস্ত শরীর ঠিক থাকবে আর তা যদি নষ্ট হয়, তবে সমস্ত শরীর বিপর্যস্ত হয়। জেনে রেখো! সেটি হচ্ছে অন্তর'।[১]

উক্ত হাদীছের মাধ্যমে রাসূল ﷺ আত্মশুদ্ধির মূল কেন্দ্রস্থল অন্তরের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। অন্তর বিশুদ্ধ না হলে বাহ্যিক আমলও শুদ্ধ হয় না। তাই আমরা বলতে পারি যে, আত্মশুদ্ধি মানে হৃদয়ের সংশোধন, সেখান থেকে তওবা, ভয় ইত্যাদি গুণ প্রকাশ পায়।

আত্মশুদ্ধির কার্যকর উপায়সমূহ: আত্মশুদ্ধি (Self-Purification) হলো নিজের মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং তা অর্জনের চেষ্টা করা। এটা ব্যক্তিগত উন্নতির একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক, যা আমাদের মানসিক শান্তি, শক্তি ও মূল্যবোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। নিম্নে আত্মশুদ্ধি অর্জনের উপায়সমূহ আলোচনা করা হলো।

১. আত্মজ্ঞান ও আত্মবিশ্লেষণ: নিজের শক্তি ও দুর্বলতা নিয়ে চিন্তা করা এবং নিজেকে গভীরভাবে জানার চেষ্টা করা আত্মশুদ্ধির প্রথম ধাপ। যেমন- (ক) আমি আজ কী কী ভালো কাজ করলাম? (খ) তার মধ্যে কোনো খারাপ কাজ ছিল কি? (গ) কীভাবে আমি আরও ভালো মানুষ হতে পারি?

২. নম্রতা অবলম্বন ও অহংকার ত্যাগ করা: অহংকার ছেড়ে বিনয়ী হওয়া, অন্যদের মতামতকে সম্মান করা এবং ভুল হলে তা স্বীকার করা।

৩. সততা ও ন্যায়পরায়ণতা: সত্যবাদিতা চর্চা করা, সৎ জীবনযাপন করা এবং ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানো।

* অধ্যয়নরত, আলিম ২য় বর্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৫২; ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৯৯; মিশকাত, হা/২৭৬২।

৪. ক্ষমা ও ধৈর্য: অন্যের ভুল মাফ করতে শেখা, পরিস্থিতির চাপ সামলানোর জন্য ধৈর্য ধরা।

৫. আত্মসংযম ও আবেগ নিয়ন্ত্রণ: ক্রোধ, ঈর্ষা ও লোভের মতো নেতিবাচক আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা। নিজের চিন্তা ও আচরণের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখার চেষ্টা করা।

৬. ধর্ম পালন ও আধ্যাত্মিক চর্চা:

(ক) ছালাত: আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ 'নিশ্চয় ছালাত অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে' *(আল-আনকাবূত, ২৯/৪৫)*।

(খ) দু'আ করা: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ 'আল্লাহর কাছে দু'আর চেয়ে মহানতম আর কিছু নেই'।[২]

(গ) তওবা ও ইসতিগফার করা: আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাও ও তাঁর দিকে তওবা করো' *(হূদ, ১১/৩)*।

(ঘ) বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করা।

৭. দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন: দুনিয়ামুখী না হয়ে আখেরাতমুখী হওয়া।

৮. মানবিকতা ও পরোপকারিতা: অন্যের কল্যাণে কাজ করা এবং দয়া ও সহানুভূতি দেখানো। অসহায় বা দুর্বলদের সাহায্য করা আমাদের অন্তরকে আরও বেশি পবিত্র করে।

৯. সময়ের সঠিক ব্যবহার: সময়কে মূল্যায়ন করা, অলসতা পরিহার করে গঠনমূলক কাজে মনোযোগী হওয়া।

১০. নিজের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ ও ইতিবাচক মানসিকতা: জীবনের সুস্পষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করা, ইতিবাচক চিন্তা করা এবং ধীরে ধীরে উন্নতির পথে এগিয়ে চলা।

১১. ইসলামী জ্ঞান অর্জন: সঠিক বিশ্বাস ও আচরণের জন্য ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী হওয়া জরুরী।

১২. মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ: আমাদের চিন্তা-ভাবনা সর্বদা দুনিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দম ফুরাবার পর সেই অনন্তকালের কথা আমাদের মনে পড়ছে না কেন?

সুধী পাঠক! ধরুন, আপনি ৫০-৬০ বছর বাঁচবেন। ৩০ বছর চলে গেছে, বাকি সময়টাকে ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ড দিয়ে ভাগ দিয়ে দেখুন আপনি আর কতদিন এ দুনিয়াতে অবস্থান করবেন। এই হিসাবটা করার মতো কেউ আছে কি? কীভাবে থাকবে? আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ - حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾ 'প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে ভুলিয়ে রেখেছে, যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও' *(আত-তাকাছুর, ১০২/১-২)*।

আল্লাহ তাআলা ক্বিয়ামতের দিন বলবেন, ﴿اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ 'পাঠ করো তোমার কিতাব (আমলনামা), আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশকারী হিসেবে যথেষ্ট' *(বানী ইসরাঈল, ১৭/১৪)*।

সেজন্য বলছি, আজই আমরা সেই হিসাবটি করে নিই যে, জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত কী কী ভালো কাজ করেছি, যে কাজটি আমার জান্নাতে যাওয়ার কারণ হবে? আর কী কী মন্দ কাজ করেছি বা আজও করছি, যার ফলশ্রুতিতে আমাকে জাহান্নামে যেতে হতে পারে?

আমাকে আজই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আগের পাপগুলোর জন্য তওবা করব। যার হক্ব তাকে ফিরিবে দেব। কাউকে গালি দিয়ে থাকলে তার কাছে যেয়ে ক্ষমা চেয়ে নিব। তাহলেই আমরা ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তি পাব, ইনশা-আল্লাহ।

আত্মশুদ্ধির উপকারিতা: আত্মশুদ্ধির উপকারিতা অনেক, তার মধ্যে কয়েকটি হলো— (ক) দুনিয়ায় শান্তি লাভ করা যায় এবং প্রশান্ত হৃদয় নিয়ে বাস করা যায়। (খ) ইবাদতে আন্তরিকতা আসে। (গ) পরকালে জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ - ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً - فَادْخُلِي فِي عِبَادِي - وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ 'হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার রবের প্রতি সন্তুষ্টচিত্তে, সন্তোষভাজন হয়ে ফিরে এসো। অতঃপর আমার বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও। আর প্রবেশ করো আমার জান্নাতে' *(আল-ফাজর, (৮৯/২৭-৩০)*। এই আয়াতটি আত্মশুদ্ধির পরিপূর্ণ ফলাফল النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (প্রশান্ত আত্মা) হলো সেই আত্মা যা আল্লাহর যিকির, ইবাদত ও নেক আমলে শান্তি খুঁজে পায়। যার আত্মা পরিশুদ্ধ, তাকেই আল্লাহ তাআলা জান্নাতে আহ্বান করবেন।

আবূ হুরায়রা رضي الله عنه থেকে এই দু'আটি বর্ণিত হয়েছে, اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا 'হে আল্লাহ! আমার আত্মাকে তাক্বওয়া দান করুন এবং একে পরিশুদ্ধ করুন। আপনি সর্বোত্তম পরিশুদ্ধকারী, আপনি তার অভিভাবক এবং মালিক'।[৩] এই দু'আটি বিভিন্ন হাদীছে বর্ণিত হয়েছে এবং এটি একজন মুসলিমের আত্মশুদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি দু'আ। এতে প্রার্থনা করা হয় আল্লাহর কাছে যেন তিনি আমাদের আত্মাকে পবিত্র করেন এবং তাক্বওয়া প্রদান করেন। কারণ শুধু আল্লাহই আমাদের আত্মাকে সঠিকভাবে পবিত্র করতে পারেন।

উপসংহার: আত্মশুদ্ধি ইসলামী জীবনের একটি অপরিহার্য অনুশীলন, যা একজন মুমিনের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির মূল চাবিকাঠি। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন, 'নিশ্চয়ই সে সফলকাম হয়েছে, যে তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে' *(আশ-শামস, ৯১/৯)*। এই আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জনের জন্য কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর নির্দেশিত পথে চলা আবশ্যক। তওবা, ইখলাছ, তাক্বওয়া, ধৈর্য, যিকির ও কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ সম্ভব। আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে আমরা আমাদের অন্তরকে কলুষতা থেকে মুক্ত করে জান্নাতের পথ প্রশস্ত করতে পারি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই মহান গুণ অর্জনের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন।

২. মুসনাদে আহমাদ, হা/৮৭৪৮ 'হাসান'।

৩. ছহীহ মুসলিম, হা/২৭২২; মিশকাত, হা/২৬৪০।

সবুজ পাখি*

-মাজহারুল ইসলাম আবির**

শাহাদাত আল্লাহর রাস্তায় নিজের প্রাণ বিলিয়ে দেওয়ার নাম। শাহাদাত অর্জন সাধারণ কোনো বিষয় নয়। এর জন্য থাকতে হয় ইস্পাতের মতো অটল ঈমান। হতে হয় ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান। সামনে ধেয়ে আসা ভয়ংকর অস্ত্র আর রক্তের স্রোত দেখেও এগিয়ে যাওয়ার অদম্য সাহস থাকতে হয়। দুনিয়ার সব সুখ আর মায়া ত্যাগ করে হতে হয় ভীষণ আত্মত্যাগী। থাকতে হয় মরণকে আলিঙ্গন করার স্পর্ধা। বুকে ধারণ করতে হয় এই বাক্য— 'আমি মুসলিম চির রণবীর, মরণকে করি না ভয়। মরলে শহীদ বাঁচলে গাজি, এই আমার পরিচয়'। তবেই পাওয়া যায় শহীদী মর্যাদা। মরেও হওয়া যায় অমর। এরকমই কয়েকজন শহীদ ছাহাবীর খণ্ডচিত্র দেখব আমরা নিচের গল্পগুলোতে। হয়তো চিত্রগুলো আমাদের ভাবনার উদ্রেক করতে পারবে।

১. আত্মার সংশোধনে কবিতার চরণ:

আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক বিশিষ্ট কবি ছিলেন। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুতার যুদ্ধের জন্য তিনজন সেনানায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, 'প্রথমে যায়েদ থাকবে। তাঁর কিছু হলে জা'ফর এগিয়ে যাবে। তাঁরও যদি কিছু হয়, তাহলে ইবনে রাওয়াহা সেনানায়ক হবে'। একসময় প্রথম দুই সেনানায়ক শহীদ হয়ে গেলেন। এবার সামনে এগিয়ে যাওয়ার পালা আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর। তিনি পতাকা হাতে নিলেন। ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন। ঠিক এ সময় তিনি তাঁর মনকে দুর্বল পেলেন ও যুদ্ধে এগোনোতে দ্বিধা করতে লাগলেন। মনকে বোঝাতে তিনি কবিতা আবৃত্তি শুরু করলেন,

أَقْسَمْتُ بِاللهِ لَتَنْزِلَنَّهْ طَائِعَةً أَوْ لَا لَتُكْرَهِنَّهْ
إن أجلب الناس وشدوا الرنه مالي أَرَاكِ تَكْرَهِيْنَ الجَنَّهْ
قَدْ طَالَ مَا قَدْ كُنْتِ مُطْمَئِنَّهْ هَلْ أَنْتِ إِلَّا نُطْفَةٌ فِي شنه

'শপথ করি, হে আত্মা! যুদ্ধে নামতে হবেই,
নামতেই হবে, না নামলে বাধ্য করা হবে।
যদিও শত্রু গর্জে উঠে, তবুও,
তুমি কি জান্নাতকে অপছন্দ করো!
দীর্ঘকাল শান্তিতে ছিলে মেতে,
আসলে তুমি তো এসেছ এক ফোঁটা বীর্যে ভেসে!'

তিনি নিজের সাথে কথোপকথনে আরও বলেন,

يَا نَفْسُ إِنْ لَا تُقْتَلِي تَمُوْتِي هَذَا حِمَامُ المَوْتِ قَدْ لَقِيْتِ
وَمَا تَمَنَّيْتِ فَقَدْ أُعْطِيْتِ إِنْ تَفْعَلِي فِعْلَهُمَا هُدِيْتِ

'হে প্রাণ! যদি শহীদ না হও, তবুও তো মরতে হবেই,
মৃত্যুর স্নানঘরে তুমি ঢুকেছ অবশ্যম্ভাবী।
যা কিছু তুমি চেয়েছ, সবই তো পেয়েছ,
যদি তাঁদের পথ ধরো, তবে হেদায়াত পাবে তুমি নিশ্চয়ই।'

এরপর তিনি তেজস্বী মনে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং শাহাদাত বরণ করেন।[১]

২. নববধূকে রেখে যুদ্ধের মাঠে গেলেন যে যুবক:

নববিবাহিতা প্রিয়তমা স্ত্রীর চেয়ে সে সময়ে ভালোবাসার আর কি কিছু হতে পারে একজন যুবকের কাছে! অবশ্যই হতে পারে। এরকমই এক আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন হানযালা ইবনু আবি আমের রাযিয়াল্লাহু আনহু। নতুন বিয়ে করেছেন তিনি। বাসর রাতটি অর্ধাঙ্গিনীর সাথে কাটিয়ে ফজর হতে না হতেই শুনতে পান উহুদ যুদ্ধের আহ্বান। তিনি আর এক মুহূর্তও দেরি করেননি। প্রেয়সীর মায়ার বাঁধন তাঁকে ঘরে আটতে রাখতে পারেনি। নববধূর প্রেমময় আঁচল ফেলে তিনি চলে গিয়েছিলেন জিহাদের মাঠে। কারণ, তাঁর কাছে ঈমান ছিল সবচেয়ে বড় ভালোবাসা। গোসল না করেই সরাসরি যুদ্ধের মাঠে চলে যান। বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে করতে একসময় তিনি শহীদ হয়ে যান। যুদ্ধে দেরি হবে বলে ফরয গোসলের সময় পাননি তিনি, কিন্তু তাঁকে সেই

---

* **সবুজ পাখি:** রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'শহীদদের রূহ সবুজ পাখির উদরে থাকবে। পাখিগুলোর জন্য আরশে ঝুলন্ত ঝাড়বাতির মতো বাসা থাকবে। তাঁরা জান্নাতের যেখানে খুশি বিচরণ করবে, পরে ঐ ঝাড়বাতিতে ফিরে আসবে' *(ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৮৭)*। এই হাদীছটির শব্দ নিয়েই লেখাটির নামকরণ করা হয়েছে 'সবুজ পাখি'।

** শিক্ষার্থী, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. ইবনে মাজাহ, হা/২২৭০; সীরাত ইবনে হিশাম, ২/৩৭৯; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৩/১৪৭, ১৫০।

গোসল করিয়েছেন স্বয়ং ফেরেশতামণ্ডলী।[২] আত্মত্যাগের বিনিময়ে তিনি পেয়ে যান غسيل الملائكة (গাসীলুল মালায়িকা)[৩] উপাধি (তথা: যাকে ফেরেশতামণ্ডলী গোসল দিয়েছেন)। হানযালা রাযিয়াল্লাহু আনহু বুঝেছিলেন, ভালোবাসার প্রকৃত পরিণতি তখনই অর্থবহ, যখন তা আল্লাহর পথে বিলীন হয়।[৪]

৩. খেজুর খেতে গেলে তো জান্নাতে যেতে দেরি হয়ে যাবে!:

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হলেন। মুশরিকদের আগেই চলে আসলেন বদর প্রান্তরে। তাঁর সাথে আছেন ছাহাবীদের একটি দল। ইসলামের জন্য যাদের এটিই প্রথম বড় যুদ্ধ। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে সম্বোধন করে বললেন, 'তোমাদের কেউ যেন কোনো কাজে এগিয়ে না যায়, যতক্ষণ না আমি নিজে আগে থাকি'। মুশরিকদের বিশাল বাহিনীও চলে এসেছে। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবীদের মন থেকে ভয় দূর করতে আর জিহাদে আগ্রহী করতে বললেন, 'তোমরা উঠে দাঁড়াও সেই জান্নাতের দিকে, যার প্রস্থ আসমান ও জমিনের সমান'। অর্থাৎ, 'তোমরা আল্লাহর রাস্তায় জান দিয়ে দিতে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলো'। এ কথা শুনে উমায়ের ইবনু হুমাম রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আসমান ও জমিনের সমান জান্নাত!' তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। এবার উমায়ের ইবনু হুমাম রাযিয়াল্লাহু আনহু অতি উৎসাহে বলে উঠলেন, 'বাখ বাখ! তথা- ওয়াও ওয়াও'। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি বাখ বাখ— বাহ, চমৎকার!' কেন বলছ? উত্তরে তিনি বললেন, 'জান্নাতে যাওয়ার আশায় বলে ফেলেছি, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'। তাঁর এমন আগ্রহ দেখে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুসংবাদ দিয়ে বললেন, 'তুমি জান্নাতী'। সুসংবাদে চোখ-মুখ ঝলমল করে উঠল উমায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর। থলে থেকে খেজুর বের করে তিনি খেতে লাগলেন। কয়েকটা খেজুর মুখে দিতেই তিনি বলে উঠলেন, 'খেজুরগুলো খাওয়া পর্যন্ত দেরি করলে তো অনেক সময় চলে যাবে! জান্নাতে যেতে দেরি হয়ে যাবে!' এই বলে তিনি খেজুরগুলো ফেলে দিলেন এবং যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকলেন যতক্ষণ না শহীদ হন।[৫]

৪. একটাও সিজদা না দিয়েই জান্নাতী:

উছাইরিম রাযিয়াল্লাহু আনহু। যার আসল নাম আমর ইবনু ছাবেত ইবনু ওয়াকশ। ইসলাম নিয়ে দীর্ঘ সময় তিনি দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদ যুদ্ধে বের হয়ে যাওয়ার পর তাঁর হৃদয়ে ইসলামের আলোর উদয় হয়। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং একটি ছালাত আদায়ের সুযোগ না পেয়েও সরাসরি তরবারি হাতে যুদ্ধে চলে যান। এক পর্যায়ে তিনি গুরুতর আহত হয়ে পড়ে থাকেন। যুদ্ধ শেষে বানূ আব্দিল আশহালের লোকেরা নিজেদের শহীদদের খুঁজছিল, তখন তাঁকে দেখে তারা অবাক হয়ে বলাবলি করতে লাগলেন, 'এ তো উছাইরিম! আমরা তো জানতাম সে ইসলাম স্বীকার করেনি!' তারা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এখানে কেন এসেছ? আত্মীয়তার কারণে, নাকি ইসলামের প্রতি ভালোবাসায়?'

তিনি বললেন, 'ইসলামের প্রতি ভালোবাসায় এসেছি আমি। আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি, ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং তরবারি হাতে রাসূলের সঙ্গে যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। তারপর আমি আহত হয়েছি'।

এই কথাগুলো বলেই তিনি তাদের হাতের উপরেই মারা গেলেন। তারা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ঘটনা খুলে বললেন। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'নিশ্চয়ই সে জান্নাতবাসী'।[৬]

৫. আমীর যুবকের গল্প:

মুছআব ইবনু উমায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন মক্কার সবচেয়ে সুদর্শন যুবক। মক্কার এক অভিজাত পরিবারে ছিল তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা-মাতা ছিল খুবই সম্ভ্রান্ত। তাঁকে তারা সবসময় সবচেয়ে উত্তম পোশাকে সাজাতেন। শহরের সবচেয়ে দামী আতর তিনি ব্যবহার করতেন। ফ্যাশনে অগ্রগামী ছিলেন তিনি। এরপর তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন পার্থিব সব সুখ তিনি বিসর্জন দেন।[৭]

মুছআব রাযিয়াল্লাহু আনহু উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেলেন। কাফনে জড়ানোর সময় দেখা গেল আরবের সবচেয়ে ধনী এই যুবকটি শুধু একটা খাটো নামীরা চাদর ছাড়া কিছুই দুনিয়াতে রেখে যাননি। যেই চাদরে মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে যায়, পা ঢাকলে মাথা বের হয়ে যায়। সেই চাদরে তাঁর মাথা ঢাকা হলো আর পা ঢাকা হলো ইদখীর নামক ঘাসে।[৮]

২. সীরাত ইবনে হিশাম, ২/৭৪।
৩. তারিখু দেমাশক, ৭/৩২৩।
৪. ছহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৭০২৫।
৫. ছহীহ মুসলিম, হা/১৯০১।
৬. মুসনাদে আহমাদ, হা/২৩৬৩৪; আল-ইসাবাহ ফি তামইযিয ছাহাবা, ২/৫২৬।
৭. সীরাত ইবনে ইসহাক, পৃ. ১৯৩।
৮. ছহীহ বুখারী, হা/৩৮৯৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৯৪০।

৬. ডানাওয়ালা যোদ্ধা:

মু'তার যুদ্ধে রাসূল ﷺ জা'ফর ইবনে আবূ তালেব রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে অন্যতম সেনাপতি হিসেবে নিযুক্ত করেন। যেই যুদ্ধে মুসলিমরা মুখোমুখি হয়েছিল শক্তিশালী রোমান সাম্রাজ্যের বিশাল বাহিনীর সাথে। প্রথম সেনাপতি যায়েদ শহীদ হলে তিনি তাঁর ডান হাতে ইসলামের পতাকা উঁচিয়ে ধরে যুদ্ধ করতে থাকেন। কাফেররা তাঁর দিকে এগিয়ে এসে তাঁর ডান হাতে আঘাত করে। ডান হাত ছিন্ন হয়ে গেলে তিনি বাম হাতে পতাকা নেন। নরপিশাচরা তাঁর বাম হাতও কেটে ফেলে। এরপরও তিনি শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত বীর বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যান। বুকে দম থাকা অবধি তিনি পতাকা মাটিতে পড়তে দেননি। পুরো যুদ্ধে তাঁর শরীর সত্তরটারও বেশি আঘাতে জর্জরিত হয়।[৯] তাঁর কাটা যাওয়া দুহাতের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তাঁকে দুটি ডানা প্রদান করেন। যেই ডানাদুটোতে ভর দিয়ে তিনি ফেরেশতাদের সাথে জান্নাতে উড়ে বেড়ান।[১০] তাঁর নামের সাথে যুক্ত হয় 'তাইয়ার' (ডানাওয়ালা জা'ফর)।[১১] তাঁর মৃত্যুতে রাসূল ﷺ-এর চেহারায় কষ্টের ভাব প্রকাশ পায়।[১২]

৭. আমি আবার শহীদ হতে চাই:

জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর খুব বেশি মন খারাপ। তাঁর এই অবস্থা দেখে রাসূল ﷺ বললেন, 'কী হয়েছে, জাবের? কেন তুমি এত ভেঙে পড়েছে?' জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, 'আমার বাবা শহীদ হয়েছেন। তিনি পরিবার ও অনেক ঋণ রেখে গেছেন'। রাসূল ﷺ বললেন, 'তুমি কি জানতে চাও, আল্লাহ তোমার বাবাকে (আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম) কী পুরস্কার দিয়েছেন?'

জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললাম, 'জি, জানতে চাই, আল্লাহর রাসূল'। তিনি ﷺ বললেন, 'আল্লাহ কখনো কারও সাথে পর্দা ব্যতীত সামনে থেকে কথা বলেননি। কিন্তু তিনি তোমার বাবাকে জীবিত করেছেন এবং সামনে থেকে সরাসরি কথা বলেছেন'। আল্লাহ তাআলা বললেন, 'কিছু চাও আমার কাছে। আমি তোমাকে দিব'। তিনি রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, হে আমার রব! আমি চাই আপনি আমাকে আবার পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিন, যেন আমি আবার আপনার রাস্তায় শহীদ হতে পারি'। আল্লাহ তাআলা বললেন, 'এটা আমার পক্ষ থেকে স্থির হয়ে গেছে— মৃত্যুর পর আর কেউ ফিরবে না'।[১৩]

৮. যার শাহাদাতে আরশ কাঁপে:

খন্দকের যুদ্ধে সা'দ ইবনে মুআয রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর হাতে আঘাত লেগে একটা জখম হয়। যেটা প্রায় সেরেই গিয়েছিল। একটি আংটি পরিমাণ জায়গায় ক্ষত অবশিষ্ট ছিল শুধু। তিনি আহত হওয়ার পর আল্লাহর কাছে আবেদন করেছিলেন, 'হে আল্লাহ! যদি রাসূল ﷺ আর কুরাইশদের মাঝে আর কোনো যুদ্ধ অবশিষ্ট থাকে, তাহলে সে যুদ্ধ পর্যন্ত আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন। আমি রাসূল ﷺ-এর শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে পছন্দ করি। আর বানূ কুরাইযার শেষ পরিণতি দেখে চোখ জুড়ানোর আগে আমাকে মৃত্যু দিয়ো না'।

বানূ কুরাইযার উপর কঠিন শাস্তির ফয়সালা দেওয়ার পর সেই সামান্য ক্ষত থেকে আবার রক্তক্ষরণ শুরু হয়। আর তিনি এই রক্তক্ষরণের কারণেই শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর মারা যাওয়ার রাতে জিবরীল আলাইহিস সালাম রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বলেন, 'কে এই ব্যক্তি, যার মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছে এবং আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়েছে?'[১৪]

সুধী পাঠক! এ তো ছিল শাহাদাতের কয়েকটি খণ্ডচিত্র মাত্র। এরকম আরও অনেক আত্মত্যাগ, সাহসিকতা, অবিচলতা, দৃঢ়তা আর বীরত্বের উদাহরণ আছে মাগাযীর পাতায়। আমাদের জানা উচিত সেইসব নির্ভীকতার ইতিহাস। তাহলে আমাদের মাঝেও আসবে শাহাদাতের তামান্না। যেই তামান্নার কথা রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মারা গেল, অথচ জিহাদ করল না; এমনকি জিহাদের কথা মনেও আনল না, সে ব্যক্তি মুনাফেক্বীর একটি শাখার উপর মৃত্যুবরণ করল'।[১৫]

৯. হাকেম, হা/৪৯৩৭।
১০. তিরমিযী, হা/৩৭৬৩।
১১. তারিখু দেমাশক, ৭২/১৩৪; হাকেম, হা/৪৯৩৭।
১২. ছহীহ বুখারী, হা/১২৯৯।
১৩. তিরমিযী, হা/৩০১০।
১৪. মুসনাদু আবি ইয়া'লা, হা/৪৪৭৭।
১৫. ছহীহ মুসলিম, হা/১৯১০।

আর্তনাদ

-সাদী মুহাম্মাদ গাউসুল হূদা
শিক্ষার্থী, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

ছালাহুদ্দীন ঘুমিয়ে গেছে
আর তো জাগে না,
আগের মতো জিহাদ তো আর
কেউ-ই করে না।
কত মায়ের বুকটা খালি
হচ্ছে দেখো আজ,
বোমার রূপে ফিলিস্তীনে
পড়ছে দেখো বাজ।
পাকিস্তানে নেই শান্তি
বাংলাও নেই ভালো,
মুসলিম আর খুঁজে পায় না
সফলতার আলো।
আলী, উমার, উছমান ঘুমায়
শান্তির কবরে,
মাহমূদ-এর অশ্ব আজ
খোঁজে তোমারে।
আজ মাটির বুকে লাগছে দেখো
রঙিন রক্ত লাল,
আলীর মতো কেউ তো ভাই
তোলে না আর ঢাল।
সিংহ আজ বিড়ালের মতো
বীরও পাচ্ছে ভয়,
মুসলিম হলো ছত্রভঙ্গ
গাযা হচ্ছে ক্ষয়।
আরব জাতি এড়িয়ে যাচ্ছে
অসহায়দের কথা,
মুসলিমদের দেহে শুধু
যন্ত্রণা আর ব্যথা।
চলে গেছে মাহমূদ গাজী
চলে গেছে বীর,
মুসলিমরা হারিয়ে ফেলেছে
সকল নদীর তীর।

আহ্বান

-শামসুন্নাহার সুমনা
শনির আখড়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

এসো নবীন! এসো তরুণ!
কুরআন-হাদীছ পড়ি,
ইসলামেরই বিধান মতে
জীবনটাকে গড়ি।
ইসলামেতেই আছে জেনো
সত্য সঠিক পথ,
থাকতে পারে জগৎ জুড়ে
যদিও শত মত।
দ্বীন ইসলামের সঠিক পথে
এসো সবাই আজ,
কুরআন-হাদীছ দিয়ে গড়ি
ইসলামী সমাজ।
সত্য ন্যায়ের পথে চলি
এসো বন্ধু সবে,
জান্নাত যাওয়ার পথটা মোদের
সহজ হবে তবে।

বৃষ্টি যখন আসে

-শামসুল আরেফীন
শ্রীপুর, গাজীপুর।

আকাশ ফেটে প্রবল বেগে
বৃষ্টি যখন আসে,
নদীনালা হাওড় তখন
পানির মাঝে ভাসে।
ধানের ক্ষেতে পানি যখন
অথৈ জলে খেলে,
নানা রকম মাছগুলো ঠিক
ক্ষেতে ধরে জেলে।
পাড়ার ছেলে আবালবৃদ্ধ
মাছের নেশায় পড়ে,
হাওড় বিলে ছোট খাদে
মাছগুলো সব ধরে।
বিলের যত মাছ আছে সব
কি যে ভালো লাগে,
দারুণ মজা লাগে খেতে
দাও পাতে যে আগে।

বাংলাদেশ সংবাদ

ভারতের পুশইন: আইনবহির্ভূত ও কূটনৈতিক চাপের কৌশল

বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অব্যাহতভাবে আইনবহির্ভূত পুশইন চালিয়ে যাচ্ছে ভারত। সীমান্তে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে বাংলাদেশ প্রতিবাদপত্র দিলেও তা আমলে নিচ্ছে না দেশটি। বিজিবি-বিএসএফের দফায় দফায় পতাকা বৈঠক সত্ত্বেও চোরাপথে পুশইনের ঘটনা বেড়েই চলেছে। নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের মতে, এসব ঘটনা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি।

বিজিবির তথ্যমতে, ৭ মে থেকে প্রতিবেদন তৈরির সময় পর্যন্ত সীমান্তের বিভিন্ন পয়েন্ট দিয়ে মোট ৯৭৫ জনকে পুশইন করেছে ভারত। এর মধ্যে খাগড়াছড়ি, কুড়িগ্রাম, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, দিনাজপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, কুমিল্লা, ফেনী, সাতক্ষীরা, মেহেরপুর ও সুন্দরবনের মান্দারবাড়িয়া এলাকা উল্লেখযোগ্য।

বিশেষজ্ঞদের অভিযোগ, ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সরকার ক্ষমতায় থাকলে তারা শান্ত থাকে, সুযোগ-সুবিধা পেলে পুশইন বন্ধ রাখে। কিন্তু সুবিধা না পেলে আবার তা শুরু করে। ১৯৯৩-৯৫ সালে বিএনপি সরকারের সময়ও এমন পুশইনের বিরুদ্ধে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বিষয়টি উত্থাপন করা হয়েছিল। বর্তমানেও এমন পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি উঠছে।

চট্টগ্রামে তিনদিনে কেএনএফের ৪৭ হাজার ইউনিফর্ম জব্দ

চট্টগ্রাম নগরের অক্সিজেন নয়ারহাট এলাকার 'রিংভো অ্যাপারেলস' নামের একটি পোশাক কারখানা থেকে ১৭ মে থেকে ২৮ মে ২০২৫ পর্যন্ত তিন দফায় প্রায় ৪৭ হাজার সামরিক পোশাক (ইউনিফর্ম) জব্দ করেছে পুলিশ। ১৭ মে প্রথম ধাপে ২০,৩০০ পিস, ২৭ মে ১১,৭৮৫ পিস এবং ২৮ মে ১৫,০০০ পিস পোশাক উদ্ধার করা হয়। ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, গত মার্চে গোলাম আজম ও নিয়াজ হায়দার নামে দুজন মংহলাসিন মারমা ওরফে মং-এর কাছ থেকে দুই কোটি টাকায় এই পোশাক তৈরির চুক্তি নেন। ধারণা করা হচ্ছে, পোশাকগুলো পাহাড়ি সশস্ত্র সংগঠন কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ)-এর জন্য তৈরি করা হয়েছিল।

মামলায় বলা হয়, কেএনএফ রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সশস্ত্র অবস্থান নিয়ে চাঁদাবাজি, হত্যা, অপহরণসহ নানা অপরাধ করছে এবং দেশের অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা বিপন্ন করতে অর্থ সংগ্রহ করছে। দুই–তিন বছর আগে ফেসবুক পেজ খুলে নিজেদের অস্তিত্ব প্রকাশ করে সংগঠনটি, এমনকি ইসলামী জঙ্গিদের প্রশিক্ষণের অভিযোগও রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। এ পর্যন্ত তারা ব্যাংক ডাকাতি, সশস্ত্র সংঘর্ষসহ নানা অপরাধে জড়িয়েছে। সামরিক পোশাক উদ্ধার ও তাদের তৎপরতায় দেশবাসী উদ্বিগ্ন, ফলে সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ব্যাপক তদন্ত শুরু করেছে।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

১২০০ ইসরাঈলি সেনার গাযা যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান

ইসরাঈলের ১২০০ সক্রিয় ও রিজার্ভ সেনা কর্মকর্তা গাযায় চলমান যুদ্ধের বিরোধিতা করে একটি খোলা চিঠিতে যুদ্ধ বন্ধ ও যিম্মীদের মুক্তির দাবি জানিয়েছেন। ইসরাঈলি পত্রিকা *হারেটজ*-এর তথ্য অনুযায়ী, এই চিঠিতে বলা হয়েছে, 'এটি ইসরাঈলের নিরাপত্তার জন্য নয়, বরং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, অনৈতিক ও ধ্বংসাত্মক একটি যুদ্ধ'।

চিঠিতে তারা সতর্ক করেছেন, যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে সৈন্যদের মানসিক স্বাস্থ্যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে এবং যুদ্ধাপরাধের ঝুঁকি বাড়বে। তারা সরকারের সিদ্ধান্ত ও সেনা নেতৃত্বের সমালোচনা করে যুদ্ধ বন্ধের জোর দাবি জানান।

এর আগে রিজার্ভ সদস্য ও সাবেক কর্মকর্তাদের স্বাক্ষরে আরেকটি চিঠিতেও যুদ্ধবিরতি ও যিম্মীদের নিরাপদে ফেরানোর আহ্বান জানানো হয়েছিল।

২০২৩ সালের অক্টোবরে শুরু হওয়া এই অভিযানে এখন পর্যন্ত ৫৪,০০০-এর বেশি ফিলিস্তীনি নিহত হয়েছেন, যাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু। ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত নেতানিয়াহু ও সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে এবং আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে গণহত্যার মামলাও চলছে।

এই চিঠি ইসরাঈলি সেনাবাহিনীর ভেতরের বিরোধ ও যুদ্ধের নৈতিকতা নিয়ে উঠা প্রশ্নের বহিঃপ্রকাশ।

মুসলিম বিশ্ব

গাযায় ৯৫% কৃষিজমি চাষের অনুপযোগী: জাতিসংঘ

গাযা উপত্যকার মাত্র ৪.৬ শতাংশ কৃষিজমি বর্তমানে চাষের উপযোগী রয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)। জাতিসংঘ স্যাটেলাইট সেন্টারের সর্বশেষ ভূ-স্থানিক জরিপ অনুযায়ী, চলমান ইসরাঈলি হামলায় গাযার ৮০% কৃষিজমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ৭৭.৮% জমিতে কৃষকের প্রবেশ সম্ভব নয়। গ্রিনহাউসের ৭১.২% এবং কৃষিকাজে ব্যবহৃত কূপের ৮২.৮% ধ্বংস হয়েছে। FAO-এর উপ-মহাপরিচালক বেথ বেচডল বলেন, 'যেখানে একসময় হাজারো মানুষের জীবিকা ও খাদ্য নিরাপত্তা ছিল, তা এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে'।

এই প্রতিবেদন এমন সময় প্রকাশিত হলো, যখন সম্প্রতি IPC বিশ্লেষণে গাযার সম্পূর্ণ জনসংখ্যা চরম দুর্ভিক্ষের ঝুঁকিতে রয়েছে বলে সতর্ক করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার সিরিয়ার ওপর থেকে

দীর্ঘ ১৪ বছর পর সিরিয়ায় নতুন সরকার গঠনের পর যুক্তরাষ্ট্র দেশটির ওপর থেকে সব ধরনের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছে। গত ২৪ মে ২০২৫, শুক্রবার ওয়াশিংটন থেকে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। এক সপ্তাহ আগেই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, তুরস্ক ও সঊদী আরবের অনুরোধে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন।

২০১১ সালে গৃহযুদ্ধ শুরুর পর বাশার আল-আসাদ সরকারের সময় যুক্তরাষ্ট্র সিরিয়ার ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। তবে নতুন সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশটি পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এ সিদ্ধান্ত শুধু সিরিয়ার নয়, বরং পুরো মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এরপর ইউরোপীয় ইউনিয়নও সিরিয়ার ওপর থেকে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে। ইইউ পররাষ্ট্রনীতি প্রধান কাজা কালাস বলেন, 'আমরা সিরিয়ার জনগণকে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও শান্তিপূর্ণ দেশ পুনর্গঠনে সহায়তা করতে চাই'।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

বিশ্বের প্রথম এআই হাসপাতাল চালু করল চীন!

চিকিৎসা ব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের পথে হাঁটল চীন। সম্প্রতি তারা চালু করেছে বিশ্বের প্রথম সম্পূর্ণ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) চালিত হাসপাতাল, যেখানে নেই কোনো ডাক্তার, নার্স বা টেকনিশিয়ান—সবই পরিচালিত হচ্ছে ভার্চুয়াল এআই চিকিৎসকের মাধ্যমে। প্রাথমিকভাবে ১৪ জন এআই ডাক্তার এখানে ২৪ ঘণ্টা নিরবচ্ছিন্নভাবে রোগ নির্ণয়, ওষুধ প্রদান ও ফলোআপ পরিচালনা করছে। ৩০ লাখের বেশি ভার্চুয়াল রোগীর তথ্য দিয়ে প্রশিক্ষিত এই প্রযুক্তি রোগ নির্ণয়ে ৯৩.৬% ও চিকিৎসা সফলতায় ৯৮% পর্যন্ত নির্ভুলতা দেখাচ্ছে। চিকিৎসক সংকট ও হাসপাতালের চাপে জর্জরিত বিশ্বে এই ব্যবস্থা সময়, খরচ ও জনসেবায় বড় পরিবর্তন আনতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এআই-ভিত্তিক স্বাস্থ্য প্রযুক্তি, ব্লকচেইন ও ক্রিপ্টো টোকেনের ক্ষেত্রেও এটি নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে। চীনের এই পদক্ষেপ ভবিষ্যতের হাসপাতালের চেহারা আমূল বদলে দিতে চলেছে।

হালাল চয়েস ফুড

আমাদের পণ্য সমূহ
১০০% খাঁটি

রকমারি ফুলের মধু
- সরিষা ফুলের মধু
- লিচু ফুলের মধু
- বরই ফুলের মধু
- কালোজিরা ফুলের মধু
- মিক্স ফুলের মধু
- পাহাড়ী ফুলের মধু
- সুন্দরবন বিখ্যাত খলিশা ফুল
- চাকের মধু

অন্যান্য জিনিস
- আখের গুড়
- মৌসুমের খেজুরের গুড়
- মধুময় বাদাম
- উন্নত মানের খেজুর
- সরিষার তেল
- কালোজিরা তেল
- জয়তুন তেল
- যবের ছাতু
- দানাদার ঘি
- বিভিন্ন ইসলামী বই

সকল যেলায় কুরিয়ারের মাধ্যমে হোম ডেলিভারী করা হয়
যোগাযোগ করুন!
০১৭৫১-১৮৯৯৫৫, ০১৫১৫-৬৪৮২১২
প্রোপাইটার
মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মামূন
ঠিকানা : ছোটবনগ্রাম (চন্দ্রিমা থানা)/ নওদাপাড়া (আমচত্বর)/ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।
Halal Choice Shop, Md. Abdullah Al-Mamun, Abdullah Mamun
১০০% খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

দাওয়াহ সংবাদ

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ কুরআন ও দ্বীন শিক্ষা : ব্যাচ নং- ০৭

দ্বীন শিখতে আগ্রহী জেনারেল শিক্ষিত ভাইদের জন্য শায়খদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে থেকে দ্বীন শিক্ষার এক সুবর্ণ সুযোগ তৈরি করেছে 'আদ-দাওয়া ইলাল্লহ'। গত ৩রা মে, ২০২৫ ইং থেকে ২২শে মে, ২০২৫ ইং পর্যন্ত বিভিন্ন জেলা থেকে আগত জ্ঞানপিপাসু দ্বীনি ভাইয়েরা 'আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহীতে একত্রিত হয়ে একটানা '২০ দিন মেয়াদী' বাংলাদেশের বিদগ্ধ উলামায়ে দ্বীনের সান্নিধ্যে থেকে হাতে-কলমে সঠিক দ্বীনের জ্ঞান, আক্বীদা-আমল, আদব-তারবিয়াত শিখেন। শবগুজারীর মাধ্যমে ইবাদতে অভ্যস্ত হন। নির্দিষ্ট সিলেবাস ও রুটিন মাফিক কোর্সটি বিনামূল্যে তারা গ্রহণ করেন। কোর্সে বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এতে ২৪ জন দ্বীনী ভাই অংশগ্রহণ করেন। 'নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর অধীন পরিচালিত 'আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ' এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর সহ-সেক্রেটারি ও 'আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ'-এর সম্মানিত পরিচালক-২ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক। এতে প্রশিক্ষক ছিলেন আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ-এর শিক্ষক ও আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ-এর দাঈগণ— আব্দুর রাযাযাক বিন ইউসুফ, মাহবুবুর রহমান মাদানী, আব্দুল আহাদ, হাসান আল-বান্নাহ মাদানী, আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক, হাফেয শহীদুল ইসলাম, মুসলেহউদ্দিন বিন সিরাজুল ইসলাম, মুহাম্মাদ আল-ফিরোজ, আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ প্রমুখ বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

উক্ত কোর্সের একটি গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণ ছিল ছালাতের প্র্যাকটিক্যাল প্রশিক্ষণ, যা মাহবুবুর রহমান মাদানী প্রদান করেন। এই প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণার্থীগণ অতি স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রহণ করেন এবং উপকৃত হন। কোর্স শেষে মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিকারী প্রশিক্ষণার্থীকে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কোর্সটির সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এই অনুষ্ঠানে স্বয়ং আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক উপস্থিত ছিলেন।

জাফর ইবনে আবু তালিব মক্তব শিক্ষক প্রশিক্ষণ : ব্যাচ নং- ২২

গত ২৪শে মে, ২০২৫ ইং শুরু হয়ে ২৯শে মে, ২০২৫ ইং পর্যন্ত '৬ দিনব্যাপী' ২২তম ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলে। এ কর্মশালায় প্রশিক্ষক ছিলেন— শায়েখ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক, আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক, মাহবুবুর রহমান মাদানী, আব্দুর রহীম বিন আব্দুর রাযযাক, হাফেয শহীদুল ইসলাম, মুসলেহউদ্দিন বিন সিরাজুল ইসলাম, মুহাম্মাদ আল-ফিরোজ, আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ প্রমুখ। ব্যাচটিতে অংশগ্রহণ করেন দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত ২৬ জন মক্তব শিক্ষক। উল্লেখ্য যে, এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্দেশ্য হলো দেশব্যাপী মক্তব শিক্ষাকে প্রসারিত করতে মক্তব-শিক্ষকের সম্পূর্ণ ফ্রি প্রশিক্ষণ দেওয়া। এর ফায়েদা হলো—

১. শিক্ষকদের প্রশিক্ষিত করে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা, ২. মক্তব-শিক্ষার্থীর স্বল্প সময়ে কুরআন শেখানোর কৌশল রপ্ত করা, ৩. শিক্ষার্থীকে সহজে আদব-আখলাক ও নীতি-নৈতিকতা শেখানো, ৪. দেশে প্রচলিত জাল-বানোয়াট ও অর্থহীন ছড়া বা গল্পের পরিবর্তে সত্য ও শিক্ষামূলক ছড়া বা গল্পের মাধ্যমে শিশুদের আন্দোলিত করা, ৫. রাসূল ﷺ ও ছাহাবী رضي الله عنهم-দের জীবনী সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা, যাতে শিক্ষার্থীবৃন্দ তাদের জীবন থেকে আদর্শ গ্রহণ করতে পারে। (আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক প্রণীত নবী ﷺ ও ছাহাবী رضي الله عنهم-দের জীবনীসম্বলিত তথ্যসমৃদ্ধ 'আদর্শ শিক্ষা' বইটি পাঠ্যভুক্ত), ৬. শিক্ষকদের হাতের লেখা চর্চা করানো হয়, যাতে শিক্ষার্থীগণ ভুল লেখা হতে বিরত থাকে এবং ৭. শিক্ষকদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দু'আ চর্চা করানো হয়, যাতে সোনামণিরা নিয়মিত দু'আ চর্চায় অভ্যস্ত হয়।

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

আক্বীদা

প্রশ্ন (১): জান্নাতে আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে আমাদের আক্বীদা বা বিশ্বাস কী?

-আনোয়ার
বগুড়া।

উত্তর: আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত বিশ্বাস করে যে, মুমিনগণ জান্নাতে আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখতে পাবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'সেদিন কতক মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল, তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে' (আল-কিয়ামাহ, ৭৫/২২-২৩)। আর আল্লাহর দর্শনই হচ্ছে তাদের জন্য সবচেয়ে বড় নিয়ামত। ছুহায়ব রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জান্নাতবাসীগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন, তোমরা কি আরও কিছু চাও, যা আমি তোমাদেরকে অতিরিক্ত প্রদান করব? তারা বলবে, আপনি কি আমাদের মুখমণ্ডলিকে উজ্জ্বল করেননি? আপনি কি আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাননি এবং আপনি কি আমাদেরকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দেননি? আপনার এত বড় বড় নেয়ামতের পর আর কী অবশিষ্ট আছে, যা আমরা চাইব?' রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'অতঃপর আল্লাহ তাআলার ও জান্নাতীদের মধ্যে হতে হিজাব বা পর্দা তুলে ফেলা হবে, ফলে তারা আল্লাহ তাআলার দীদার বা দর্শন লাভ করবে। তখন তারা বুঝতে পারবে যে, বস্তুত আল্লাহ তাআলার দর্শনলাভ ও তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকা অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় কোনো বস্তুই এ যাবৎ তাদেরকে প্রদান করা হয়নি' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৮১)।

প্রশ্ন (২): আমরা কীভাবে তাক্বওয়া অর্জন করতে পারি?

-শাহাবুদ্দীন
সদর, যশোর।

উত্তর: তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি হলো অন্তরের জিনিস। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তাক্বওয়া এখানে আছে'- এ কথা বলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার তাঁর বক্ষের প্রতি ইঙ্গিত করলেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৬৪৩৫)। তাক্বওয়া বৃদ্ধি করার মাধ্যম হলো- ১. আল্লাহর আদেশকৃত কাজগুলো করা, নিষেধকৃত কাজগুলো ছেড়ে দেওয়া এবং তাঁর দেখানো পথের উপর চলা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যারা সৎপথ অবলম্বন করে, তাদেরকে আল্লাহ সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে ধর্মভীরু হওয়ার শক্তি দান করেন' (মুহাম্মাদ, ৪৭/১৭)। ২. বেশি বেশি ছিয়াম পালন করা তাক্বওয়া বৃদ্ধির একটি অন্যতম মাধ্যম। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য ছিয়ামের বিধান দেওয়া হলো, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা তাক্বওয়ার অধিকারী হতে পার' (আল-বাকারা, ২/১৮৩)। ৩. উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া তাক্বওয়া অর্জনের একটি মাধ্যম। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি হচ্ছে আসমানসমূহ ও যমিনের সমান, যা মুত্তাক্বীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে, যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল। আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন' (আলে ইমরান, ৩/১৩৩-১৩৪)। ৪. আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হেদায়াতকে আঁকড়ে ধরা ও বিদআত থেকে দূরে থাকা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর এটি তো আমার সোজা পথ। সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ করো এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। ৫. নিয়মিত ছালাত আদায় করা। ছালাত তাক্বওয়ার অন্যতম বড় চর্চা। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় ছালাত অশ্লীলতা ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে' (আল-আনকাবূত, ২৯/৪৫)। ৬. সৎ ও পরহেজগার বন্ধু বানানো। কারণ ভালো বন্ধু ও পরিবেশ একজন ব্যক্তিকে সৎ পথে পরিচালিত করে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'মানুষ তার বন্ধুদের দ্বীনের উপর থাকে। সুতরাং তোমরা দেখো কার সঙ্গে মেলামেশা করছো' (মিশকাত, হা/৫০১৯)। ৭. কুরআনের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা। প্রতিদিন কুরআন পাঠ করা, তার অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝা এবং জীবনে তা প্রয়োগ করার চেষ্টা করা। আল্লাহ বলেন, 'এই কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ নেই, এটা মুত্তাক্বীদের জন্য পথনির্দেশ' (আল-বাকারা, ২/২)। ৮. দুনিয়াকে নয়, আখেরাতকে অগ্রাধিকার দেওয়া। দুনিয়ার ফিতনা থেকে নিজেকে রক্ষা করা এবং আখেরাতের জবাবদিহির ভয় রাখা। ৯. নিয়মিত আত্মসমালোচনা ও তওবা করা। প্রতিদিন নিজের কাজের হিসাব রাখা, ভুল হলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিদিন ৭০-১০০ বার তওবা করতেন (ছহীহ মুসলিম, হা/২৭০২)। ১০. এ দু'আ পড়া, اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى (ছহীহ মুসলিম, হা/২৭২১)। আল্লাহ বলেন, 'এগুলো তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা তাক্বওয়া অবলম্বন করতে পার' (আল-আনআম, ৬/১৫৩)।

প্রশ্ন (৩): আমীর (রাষ্ট্রপ্রধান) যদি মুশরিক (তাগূতের অনুসারী) হয়, সেক্ষেত্রে একজন মুসলিম নাগরিকের করণীয় কী? মুশরিক (তাগূতের অনুসারী) আমীর (রাষ্ট্রপ্রধান)-কে ট্যাক্স দেওয়া যাবে কি? মুশরিক আমীরের মানব রচিত আইন মানা যাবে কি? এসকল ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-এর দিকনির্দেশনা কী?

-অনিক ইবনে হাসান।

উত্তর: সরকার যদি অমুসলিম হয়, তাহলে একজন মুসলিম তার দেশে বসবাস করলে সম্ভবপর সরকারি নিয়ম মেনেই তাকে চলতে হবে। তাতে যদি কোনো জায়গায় ইসলামকে অস্বীকার করতে হয়, তাহলে সেখানে থাকা যাবে না। আর সরকার যদি মুসলিম হয় এবং ছালাতকে অস্বীকার না করে, তাহলে সম্ভবপর সে সরকারের নিয়মকানুন মেনেই চলতে হবে। উম্মু সালামা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, ‘তোমাদের উপর এরূপ কতিপয় আমীর নিযুক্ত করা হবে (যারা ভালো-মন্দ উভয় কাজই করবে), তোমরা তা বুঝতে পারবে এবং অপছন্দও করবে। যে তাদের অপছন্দ করল, সে মুক্তি পেল এবং যে প্রত্যাখ্যান করল, সে নিরাপদ হলো। কিন্তু যে (তাদের প্রতি) সন্তুষ্ট থাকল এবং অনুসরণ করল, সে ক্ষতিগ্রস্ত হলো’। লোকেরা জানতে চাইল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? তিনি বললেন, ‘না, যতক্ষণ তারা ছালাত আদায়কারী থাকবে’ (ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৫৪)। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের বলেছেন, ‘আমার পরে তোমরা অবশ্যই এমন স্বার্থপর শাসক ও শরীআহ বিরোধী কাজ দেখতে পাবে, যা তোমরা পছন্দ করবে না’। তারা জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! তাহলে আমাদের জন্য কী হুকুম করছেন? উত্তরে তিনি বললেন, ‘তাদের হক্ব পূর্ণরূপে আদায় করবে আর তোমাদের হক্ব আল্লাহর কাছে চাইবে (ছহীহ বুখারী, হা/৭০৫২)।

প্রশ্ন (৪): মুসলিমরা বিধর্মীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে পারবে কি?

-শহীদ আলম
রাজশাহী।

উত্তর: মুসলিমরা বিধর্মীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে মুমিনগণ! তোমরা মুমিনগণ ছাড়া কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না’ (আন-নিসা, ৪/১৪৪)। তিনি আরও বলেন, ‘হে মুমিনগণ! তোমরা ইয়াহূদী ও নাছারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু’ (আল-মায়েদা, ৫/৫১)। তবে তাদের সাথে সদাচরণ করা যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আল্লাহ তোমাদেরকে সেইসব লোকের প্রতি সদ্ব্যবহার ও ন্যায়বিচারে নিষেধ করেন না, যারা তোমাদের সাথে ধর্ম নিয়ে যুদ্ধ করে না এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দেয় না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন। তবে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে, যারা তোমাদের সাথে ধর্ম নিয়ে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দিয়েছে এবং তোমাদেরকে বের করতে সহায়তা করেছে’ (আল-মুমতাহিনা, ৬০/৮-৯)।

প্রশ্ন (৫): মৃত বাচ্চা জন্ম নিলে তার কি আকীকা দিতে হবে? নিষ্পাপ হিসেবে সে বাচ্চা কি তার পিতামাতার জন্য কিয়ামতের মাঠে সুপারিশ করতে পারবে? উল্লেখ্য, বাচ্চা জন্ম নেওয়ার ২/৩ দিন আগে নড়াচড়া করেছিল।

-হাকীম নাহিদ পারভেজ
সাতক্ষীরা।

উত্তর: জন্মের পর সন্তান যদি সপ্তম দিনের আগে মারা যায় তাহলে তার আকীকা করা লাগবে না। কেননা রাসূল সা. বলেন, ‘প্রত্যেক শিশু তার আকীকার বিনিময়ে বন্ধক থাকে। তার জন্মের সপ্তম দিনে আকীকা করতে হয়’ (আবূ দাঊদ, হা/২৮৩৮)। বিস্তারিত দেখুন- তুহফাতুল আহওয়াজী, ৫/৯৮। আর মায়ের পেটে বাচ্চার বয়স যদি ৪ (চার) মাস হয়ে যায়, তাহলে সেই বাচ্চা বাবা-মায়ের জন্য সুপারিশ করবে। চার মাস বা ১২০ দিনের আগে বাচ্চা হিসেবে গণ্য হবে না। কেননা চার মাস পর তাতে রূহ দেওয়া হয় এবং তার আমল, রিযিক, আয়ু ও ভালো-মন্দ লিপিবদ্ধ করা হয়। রাসূল ﷺ বলেন, ‘নিশ্চয় তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপাদান নিজ নিজ মায়ের পেটে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বীর্যরূপে অবস্থান করে, অতঃপর তা জমাটবাঁধা রক্তে পরিণত হয়। ঐভাবে চল্লিশ দিন অবস্থান করে’ (ছহীহ বুখারী, হা/৩২০৮; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৪৩)।

প্রশ্ন (৬): কুরআনের আয়াত অর্থসহ বুঝে পড়া কি ফরয? অর্থ না বুঝলে কি পাপ হবে?

-মেহেদী
হবিগঞ্জ।

উত্তর: মানুষকে কুরআন বুঝে ও সুন্দর উচ্চারণে পড়তে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আর কুরআন তিলাওয়াত করুন ধীরে ধীরে তারতীল সহকারে’ (আল-মুযযাম্মিল, ৭৩/৪)। তবে না বুঝলেও কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে। মাখরাজ সুন্দর করে উচ্চারণ করতে না পারলেও তেলাওয়াত করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তোমাদের জন্য যা সহজ, তা পাঠ করো’ (আল-মুযযাম্মিল, ৭৩/২০)। এসময় চেষ্টার কারণে সে দ্বিগুণ নেকী পাবে’ (ছহীহ মুসলিম, হা/৭৯৮)।

প্রশ্ন (৭): আমি প্রায়ই স্বপ্নে খারাপ কিছু দেখি- মৃত্যু বা বিপদ। ঘুম থেকে উঠে দেখি, বাস্তবেও এমন ঘটনা ঘটে গেছে। ফজরের ছালাতের পর ঘুমালে এমন স্বপ্ন বেশি দেখি। স্বপ্নে কিছু দেখলে আমি বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলি, শয়তান থেকে আশ্রয় চাই এবং দুই রাকআত ছালাত পড়ি; তবুও অনেক সময় বিপদ এড়াতে পারি না। কেন এমন হয়? আমি এসব স্বপ্ন দেখি কেন? খারাপ স্বপ্ন ও এর ক্ষতি থেকে বাঁচার উপায় কী?

-জামান
ঢাকা।

উত্তর: খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। খারাপ স্বপ্ন দেখলে বাম দিকে থুথু নিক্ষেপ করে শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করে ঘুমাবে, তা কারো কাছে বলবে না। তাহলে এতে কোনো ক্ষতি হবে না। আবূ ক্বাতাদা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'সৎ ও ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। আর মন্দ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। অতএব, তোমাদের কেউ যখন ভীতিকর মন্দ স্বপ্ন দেখে, তখন সে যেন তার বাম দিকে থুথু নিক্ষেপ করে আর শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। কেননা এরূপ স্বপ্ন তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না' (ছহীহ বুখারী, হা/৩২৯২; মুসনাদে আহমাদ, হা/২২৬১৭)। আরেক বর্ণনায় আছে, 'সে যেন পার্শ্ব পরিবর্তন করে ঘুমায়' (সুনানে আবী দাঊদ, হা/৫০২২)। অন্য বর্ণনায় আছে, 'সে যেন দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করে' (ছহীহ মুসলিম, হা/৫৭৯৮)।

প্রশ্ন (৮): আমার মা কিছুদিন আগে একটা হাদীছের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে, যদি প্রতি ১০০০ মানুষের মধ্যে ১ জন মানুষ জান্নাতে যায়; তাহলে আল্লাহ কাদের তওবা কবুল করল? আমি এ প্রশ্নের উত্তর জানতে চাই।

-বাপ্পি হোসেন
দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

উত্তর: ১০০০ জনের মাঝে ৯৯৯ জন হবে ইয়াজুজ মা'জুজ থেকে আর একজন হবে মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মতের মাঝ থেকে। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'মহান আল্লাহ ডাকবেন, হে আদম! তখন তিনি জবাব দিবেন, আমার সৌভাগ্য, আমি হাযির এবং সকল কল্যাণ আপনার হতেই। তখন আল্লাহ বলবেন, জাহান্নামীদেরকে বের করে দাও। আদম (আলাইহিস সালাম) বলবেন, জাহান্নামী কারা? আল্লাহ বলবেন, প্রতি হাজারে ৯৯৯ জন। আল্লাহ বলেন, 'সেদিন তুমি দেখবে প্রতিটি দুগ্ধদায়িনী ভুলে যাবে তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে আর প্রত্যেক গর্ভবতী গর্ভপাত করে ফেলবে, আর মানুষকে দেখবে মাতাল, যদিও তারা প্রকৃতপক্ষে মাতাল নয়; কিন্তু আল্লাহর শাস্তি বড়ই কঠিন (যার কারণে তাদের ঐ অবস্থা ঘটবে) (আল-হজ্জ, ২২/২)। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমাদের মধ্যে সেই একজন কে? তিনি বললেন, 'তোমরা সুসংবাদ গ্রহন করো। কেননা তোমাদের মধ্যে হতে একজন আর এক হাজারের অবশিষ্ট ইয়াজুজ-মা'জুজ হবে'। অতঃপর তিনি বললেন, 'যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! আমি আশা করি, তোমরা সমস্ত জান্নাতবাসীর এক-তৃতীয়াংশ হবে'। (আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন) আমরা এ সংবাদ শুনে আবার আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর দিলাম। তিনি আবার বললেন, 'আমি আশা করি তোমরা সমস্ত জান্নাতীদের অর্ধেক হবে'। এ কথা শুনে আমরা আবারও আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর দিলাম। তিনি বললেন, 'তোমরা তো অন্যান্য মানুষের তুলনায় এমন, যেমন সাদা ষাঁড়ের দেহে কয়েকটি কাল পশম অথবা কালো ষাঁড়ের শরীরে কয়েকটি সাদা পশম' (ছহীহ বুখারী, হা/৩৩৪৮)।

ছালাত

প্রশ্ন (৯): পুরুষ ইমামের যদি ভুল হয়, তাহলে পেছন থেকে মুছল্লীগণ 'সুবহানাল্লাহ' বলবে এবং মহিলাদের জামাআতে যদি ইমামের ভুল হয়, তাহলে পেছন থেকে মুছল্লীগণ হাতের উপর তালু রেখে শব্দ করবে। এমনি হাদীছ শুনেছিলাম। কিন্তু আমাদের এখানে ইমামের ভুল হলে পেছন থেকে মুছল্লীগণ ইমাম যেই যায়গায় ভুল করে তারা সেই আয়াত বলে দেয়। এটা কি সঠিক?

-আব্দুর রাকিব
ময়মনসিংহ।

উত্তর: ছালাত আদায়ে ইমামের কোনো ভুল হলে মুছল্লীগণ তা সংশোধন করে দিবেন। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, '(ইমাম যখন ছালাতে ভুল করে তাকে সতর্ক করার জন্য) পুরুষ মুক্তাদীগণ 'সুবহানাল্লাহ' বলবে এবং স্ত্রীলোকেরা 'হাততালি' দিবে' (তিরমিযী, হা/৩৬৯)। ইমামের কিরাআতে কোনো ভুল হলে বা ভুলে গেলে মুক্তাদীগণ তা স্মরণ করিয়ে দিবে। মিসওয়ার ইবনে ইয়াযীদ আল-মালিকী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে ছালাত আদায় করি। ছালাতের মধ্যে তাঁর পঠিত আয়াতের কিছু অংশ ভুলবশত ছুটে যায়। তখন ছালাত শেষে এক ব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি অমুক অমুক আয়াত ছেড়ে

দিয়েছেন। জবাবে তিনি বলেন, ‘তুমি তখন আমাকে স্মরণ করিয়ে দাওনি কেন?’ (আবূ দাঊদ, হা/৯০৭)। সুতরাং ইমামের কিরাআতে ভুল হলে বা কোনো আয়াত ছুটে গেলে বা ভুলে গেলে মুক্তাদীদের দায়িত্ব হলো সেই আয়াত পড়ে তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া।

প্রশ্ন (১০): মহিলাদের ফরয ছালাতে ইক্বামত দেওয়া কি জরুরী?

-ফিরোজ কবীর
তংকাশিবপুর, মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তর: মহিলাদের ইক্বামত দিয়ে ছালাত পড়াই সুন্নাত। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি আযান ও ইক্বামত দিয়ে মহিলাদের ইমামতি করাতেন। তিনি তাদের মাঝখানে দাঁড়াতেন (সুনানে কুবরা, বায়হাক্বী, হা/১৯৪৩)।

প্রশ্ন (১১): ছালাতে রুকূ থেকে সিজদায় যেতে হাত আগে মাটিতে দিব না হাঁটু আগে মাটিতে দিব?

-কফিল উদ্দীন
মালেয়শিয়া।

উত্তর: সিজদায় যাওয়ার সময় আগে মাটিতে হাত রাখাই সুন্নাত। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘তোমাদের মধ্যে কেউ যখন সিজদা করবে, তখন যেন উটের শয়নের মতো না করে। সে যেন দুই হাঁটুর আগে দুই হাত রাখে’ (আবূ দাঊদ, হা/৮৪০)। ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি যখন সিজদা করতেন, তখন দুই হাঁটু রাখার আগে দুই হাত রাখতেন এবং তিনি বলতেন রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন করতেন (হাকেম, হা/৮২১; শারহু মাআনীল আছার, হা/১৫১৩; ইবনু খুযায়মা, হা/৬২৭)। আগে হাঁটু রাখার পক্ষে যে কয়টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ (আবূ দাঊদ, হা/৮৩৮ ও ৮৩৯)।

প্রশ্ন (১২): ছালাতের মাঝে হাই আসলে করণীয় কী?

-মাজিদুল ইসলাম
নোয়াখালী।

উত্তর: ছালাতে হাই আসলে যথাসাধ্য তা প্রতিহত করার চেষ্টা করবে। হাই আসার কারণে ছালাতের কোনো ক্ষতি হবে না। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘হাই শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। সুতরাং তোমাদের কারও যখন হাই আসে, তখন যেন সে তা প্রতিরোধ করে। কারণ কেউ যখন ‘হা’ বলে, তখন শয়তান হাসে’ (ছহীহ বুখারী, হা/৩১১৫; ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৯৪)। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘হাঁচি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আর হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং তোমাদের মাঝে কেউ হাই তুললে সে যেন মুখের উপর হাত রাখে’ (মুসনাদে আহমাদ, হা/৭২৯৪)। সুতরাং ছালাতে হাই আসলে যথাসাধ্য তা প্রতিহত করার চেষ্টা করবে। সক্ষম না হলে, হাই উঠার সময় মুখে হাত দিবে (আল-আযকার, ‘নববী’)।

প্রশ্ন (১৩): মসজিদের দেওয়ালে ‘সামনের কাতার পূরণ করুন এবং মোবাইল ফোন বন্ধ রাখুন’ এভাবে লেখা যাবে কি?

-আকিমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর: এগুলো মসজিদের সামনে লিখে রাখা যাবে না। কারণ এতে মুছল্লীদের দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ হয় এবং তাদের ছালাতের মাঝে বিঘ্ন ঘটে (ছহীহ বুখারী, হা/৩৭৩)। তবে মসজিদে মুছল্লীদেরকে ‘কাতার সোজা করুন ও সামনের কাতার পূরণ করুন’ বলা শরীআতসম্মত ও সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বয়ং কাতার সোজা করার ব্যাপারে জোর দিতেন এবং বলেন, سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. ‘তোমরা কাতার সোজা করো, কেননা কাতার সোজা করা ছালাতের পরিপূর্ণতার অন্তর্ভুক্ত’ (ছহীহ বুখারী, হা/৭২২)। ইমাম ছাহেব এই বাক্যগুলো বলবেন। কিন্তু মসজিদের দেওয়ালে ‘সামনের কাতার পূরণ করুন এবং মোবাইল ফোন বন্ধ করুন’ লিখে রাখা যাবে না।

প্রশ্ন (১৪): বাচ্চারা মসজিদে আসলে তাদের ধমক দেওয়া বা নিষেধ করা যাবে কি?

-হাসান আলী
নাটোর।

উত্তর: কোমলমতি শিশুদের সর্বদা ভালোবাসা আর আদর-যত্ন দিয়ে মানুষ করতে হবে। তাদের সাথে কখনো রূঢ় আচরণ করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ ও বড়দের সম্মান করল না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়’ (মুসনাদে আহমাদ, হা/৬৭৩৩; মিশকাত, হা/৪৯৭০)। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন সিজদায় যেতেন, তখন হাসান ও হুসাইন তাঁর পিঠে চড়তেন। তারা যখন তাদের বাধা দিতে চাইত, তখন তিনি ইঙ্গিত করতেন, তোমরা তাদের ছেড়ে দাও। যখন তিনি ছালাত শেষ করতেন, তখন তাদের কোলে রাখতেন আর বলতেন, ‘যে আমাকে ভালোবাসে সে যেন এদের ভালোবাসে’ (মুসনাদে ইবনু আবী শায়বা, হা/৩৯৮; সিলসিলা ছহীহা, হা/৩১২)। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চেয়ে বড় পরহেজগার আর কে আছে? তিনি যদি ছালাতরত অবস্থায় বাচ্চা কোলে নিয়ে ছালাত আদায় করতে পারেন, তাহলে আমরা কেন আমাদের বাচ্চাদের মসজিদে নিয়ে গেলে ধমক দিব, তাদের নিয়ে ছালাত আদায় করতে পারব না? তবে এমনিতেই দুষ্টুমি লাফালাফি করে পরিবেশ নষ্ট করলে, পরিবেশ ঠিক করার জন্য সতর্ক করতে পারে।

প্রশ্ন (১৫): পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের মধ্যে কেউ যদি এক ওয়াক্ত ছালাত ইচ্ছাকৃত ত্যাগ করে, তাহলে কি সে পুরোপুরি কাফের হয়ে যাবে? স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি এরকম হয়, তাহলে কি বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে? স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজন এরকম করলে করণীয় কী?

-নজরুল ইসলাম।

উত্তর: ইচ্ছা করে ছালাত ত্যাগ করা দুই ধরনের- ১. ছালাতকে অস্বীকার করা। এসময় মানুষ মুরতাদ হয়ে যাবে এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। ২. শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে ছালাত আদায় করে না। ছালাতের কথা বললে বলে, পড়ব। এমতাবস্থায় সে বড় পাপী হবে এবং আল্লাহর যিম্মা তার উপর থেকে উঠে যাবে। নবী ﷺ বলেন, 'ইচ্ছা করে ছালাত পরিত্যাগ করবে না। তা করলে আল্লাহর যিম্মাদারী উঠে যাবে' (ইবনু মাজাহ, হা/৪০৩৪)।

প্রশ্ন (১৬): জনৈক আলেম বলেন, আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা মসজিদে বিলম্বে জামাআতে ছালাত আদায় করার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কোনো মসজিদে বিলম্বে ছালাত আদায় করলে বাড়িতে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করতে হবে। এ বক্তব্য কি ছহীহ?

-আকিমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর: প্রথমত, সব ওয়াক্তের ক্ষেত্রে এমন হয় না। শুধুমাত্র ফজর ও আছরের ছালাতের ক্ষেত্রে সাধারণত এমন হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে যে ওয়াক্তে সময়মতো আদায় করা হবে না সেই ওয়াক্ত ব্যতীত বাকি ওয়াক্তে মসজিদে গিয়ে পড়াই উচিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলো, কোন কাজটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন, 'আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা' (তিরমিযী, হা/১৭০)। নবী ﷺ আবূ যার رضي الله عنه-কে বলেছিলেন, 'হে আবূ যার! আমার পরে অচিরেই এমন আমীর বা শাসকদের আবির্ভাব ঘটবে যারা একেবারে শেষ ওয়াক্তে ছালাত আদায় করবে। এরূপ হলে তুমি কিন্তু সময়মতো (ছালাতের উত্তম সময়ে) ছালাত আদায় করে নিবে। পরে যদি তুমি তাদের সাথে ছালাত আদায় কর, তাহলে তা তোমার জন্য নফল হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি তা না হয়, তাহলে তুমি অন্তত তোমার ছালাত রক্ষা করতে সক্ষম হলে' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৫২)।

প্রশ্ন (১৭): বিদআতীদের সাথে একত্রে হাত তুলে মুনাজাত না করে একা মুনাজাত করা যাবে কি?

-মো. আব্দুর রহিম
শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : শরীআত সিদ্ধ জায়গা ব্যতীত অন্য স্থানে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দু'আ করা বিদআত। সুতরাং এমন স্থানে যে কারো সাথে সম্মিলিত মুনাজাতে অংশগ্রহণ করা যাবে না। আয়েশা رضي الله عنها বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু নতুন চালু করল, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তাহলে তা পরিত্যাজ্য' (ছহীহ বুখারী, হা/২৫৫০; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮)। একাকী সময়ের গতিতে প্রয়োজন সাপেক্ষে দু'আ করবে; নিয়মিত নয়।

কবর

প্রশ্ন (১৮): মহিলাদের লাশ কি মাহরামকেই কবরে নামাতে হবে নাকি অন্য কেউ নামাতে পারে?

-আহনাফ
রাজশাহী।

উত্তর: দাফনে পারদর্শী ব্যক্তিই লাশ কবরস্থ করার দায়িত্ব পালন করবে। এক্ষেত্রে মাহরাম আর গায়রে মাহরাম বিবেচ্য নয়। আনাস ইবনু মালেক رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল ﷺ-এর কন্যার জানাযায় উপস্থিত হলাম। এমতাবস্থায় রাসূল ﷺ কবরের নিকট বসা ছিলেন। আমি দেখলাম তাঁর চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রু ঝরছে। অতঃপর তিনি বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কি কেউ এমন আছে, যে গত রাতে স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়নি?' আবূ তালহা رضي الله عنه বললেন, হ্যাঁ, আছি, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি। তিনি বললেন, '(মাইয়্যেতকে কবরে রাখার জন্য) তুমিই কবরে নামো'। তখন তিনি কবরে নামলেন (ছহীহ বুখারী, হা/১৬৬৫; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৬৬৭৫)। এই হাদীছে আবূ তালহা رضي الله عنه নবী কন্যার মাহরাম ছিলেন না। তবে মাহরামের মধ্যে এমন ব্যক্তি পাওয়া গেলে তা উত্তম। কাসেম ইবনু আব্দুল্লাহ বলেন, রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর পর যে স্ত্রী মারা যান, তিনি হলেন যায়নাব বিনতু জাহশ رضي الله عنها। ...তার মৃত্যুর পর উমার رضي الله عنه রাসূল ﷺ-এর অন্যান্য স্ত্রীদের নিকট সংবাদ পাঠালেন যে, কে তাকে গোসল দিবে, তাকে কর্পূর লাগাবে এবং কাফন দিবে? তারা বললেন, আমরা। তারা সে দায়িত্ব বাস্তবায়ন করলেন। আবার সংবাদ পাঠালেন কে তাকে কবরস্থ করবে? তারা বললেন, তার জীবদ্দশায় তার সাথে যাদের সাক্ষাৎ করা বৈধ ছিল। উপস্থিত ব্যক্তিরা বললেন, হে লোক সকল! তোমরা সরে যাও। সকলকে কবরের পাশ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হলো। অতঃপর দুইজন তার পরিবারের (মাহরামের) দুইজন পুরুষ তাকে কবরস্থ করলেন (জামেউল আহাদীছ, হা/৩১২৬৬; কানযুল উম্মাল, হা/৩৭৭৯৭)।

জায়েয-নাজায়েয

প্রশ্ন (১৯): প্রত্যেক পুরুষের জন্য টাখনুর উপরে কাপড় পড়া ফরয হয়, তাহলে ইদানীং শহরে কিছু কিছু মুছল্লী পাওয়া যায় যাদের জুব্বার কারণে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঢেকে আছে। শরীআতের ভিত্তিতে এটা কতটুকু জায়েয?

-মিজানুর রহমান ভূইয়াঁ
ময়মনসিংহ সেনানিবাস।

উত্তর: টাখনুর নিচে কাপড় পড়া হারাম। টাখনুর নিচে কাপড় পরার পরিণতি জাহান্নাম। রাসূল ﷺ বলেন, 'ইযারের যে পরিমাণ টাখনুর নিচে যাবে, সে পরিমাণ জাহান্নামে যাবে' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৩৭১)। রাসূল ﷺ আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি গর্বের সঙ্গে পরনের কাপড় টাখনুর নিম্নভাগে ঝুলিয়ে চলাফেরা করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিবেন না' (ছহীহ বুখারী, হা/৩৬৬৫)। শরীরের উপর থেকে যে কাপড় পরিধান করা হয়, যেমন- জামা, পায়জামা, লুঙ্গি সেগুলো অত্র হাদীছের অন্তর্ভুক্ত। আর যেগুলো পায়ের নিচ দিক থেকে পরিধান করা হয়, যেমন- জুতা, মোজা এগুলো অত্র হাদীছের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং জুব্বা এত লম্বা হওয়া যাবে না, যা টাখনুর নিচে চলে যায়। এমন জুব্বা পরিধান করা যাবে না।

প্রশ্ন (২০): হিন্দু বা বিধর্মীদেরকে সালাম দেওয়া জায়েয হবে কি? অনেক সময় তারাই আগে 'আস-সালামু আলাইকুম' বলে, তখন কি তাদের 'আদাব' বলা যাবে? বা কী বলে উত্তর দিব?

-আব্দুর রহমান রনি
কালিহাতী, টাঙ্গাইল।

উত্তর: হিন্দু বা কোনো বিধর্মীকে আগে সালাম দেওয়া যাবে না। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'তোমরা ইয়াহূদী ও নাছারাদেরকে প্রথমে সালাম দিও না। তাদের সাথে পথে দেখা হলে সংকীর্ণ পাশ দিয়ে যেতে বাধ্য করো' (ছহীহ মুসলিম, হা/২১৬৭)। তবে তারা সালাম দিলে শুধু 'ওয়ালাইকুম' বলে উত্তর দিতে হবে। আদাব বা তাদের ধর্মীয় কোনো কথা বলা যাবে না। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যখন কোনো আহলে কিতাব তোমাদেরকে সালাম দিবে, তখন তোমরা বলো ওয়ালাইকুম' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯০৩; ছহীহ মুসলিম, হা/২১৬৩)।

প্রশ্ন (২১): আমার চাচার এক ছেলে, দুই মেয়ে। ছেলেটা প্রচণ্ড নেশাগ্রস্ত এবং ভালো হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তিনি আশঙ্কা করছেন যে, তার মৃত্যুর পরে মেয়েদেরকে সম্পত্তি দেওয়া হবে না। তাই তিনি জীবিত অবস্থায় কি তার মেয়েদেরকে সম্পত্তি বণ্টন করে যেতে পারবেন? দয়া করে উত্তরটি জানাবেন।

-মো. রাইহান
ঢাকা।

উত্তর: শরীআতের বিধান অনুযায়ী মৃত্যুর পর বণ্টন হওয়াই কল্যাণকর। তবে মৃত্যুর আগে বণ্টন করতে চাইলে অংশ হারেই করতে হবে। নু'মান বিন বাশীরকে কিছু দেওয়া হলে তার বাবাকে রাসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার সব ছেলেকেই কি এ রকম করেছ?' তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তবে আল্লাহকে ভয় করো এবং আপন সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা করো'। অতঃপর তিনি ফিরে গেলেন এবং তার দান ফিরিয়ে নিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/২৫৮৭)।

প্রশ্ন (২২): গর্ভবতী মহিলাদেরকে সরকার থেকে গর্ভবতী ভাতা হিসেবে বেশ কিছু টাকা দিয়ে থাকে। এই টাকা নেওয়া এবং ভাতার জন্য আবেদন করার কাগজপত্রের সাথে একটি মুখমণ্ডল খোলা রেখে পাসপোর্ট সাইজের ছবি জমা দেওয়া কি বৈধ হবে?

-মাসূদ বিন আইয়ুব
মির্জাপুর, টাঙ্গাইল।

উত্তর: প্রথমত, উক্ত ভাতা গ্রহণের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলির যথাযথভাবে পূরণ করতে সক্ষম হলে এবং শরীআতের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো শর্ত না থাকলে ভাতা গ্রহণে কোনো সমস্যা নেই। কোনো দুর্নীতির আশ্রয় না নিয়ে যথাযথ হক্বদার হলে সে তা গ্রহণ করতে পারে। দ্বিতীয়ত, জরুরী প্রয়োজন না হলে মেয়েদের মুখমণ্ডল খোলা রেখে ছবি তোলা বা তা কোথাও ব্যবহার করা উচিত নয়। তবে জরুরী প্রয়োজন হলে ব্যবহার করা যায় (মুগনী, ৭/৪৫৯; আশ-শারহুল কাবীর, ৭/৩৪৮)।

প্রশ্ন (২৩): আমি মার্কেটিং চাকরিতে গার্মেন্টসে স্যাম্পল নিয়ে যাই। মাঝে মাঝে হেঁটে গিয়ে ১০-২০ টাকা ভাড়া বাঁচাই। ওই ভাড়া বিল হিসেবে দাবি করা কি বৈধ হবে?

-সিয়াম শিকদার
চিতলমারী, বাগেরহাট।

উত্তর: না, বৈধ হবে না। আপনি যতটুকু খরচ করেছেন, ততটুকুই ভাউচার দেখাতে হবে। আর যা খরচ করেননি তা যদি ভাউচার দেখান, তাহলে তা ধোঁকা হবে। আর ইসলামে ধোঁকা দেওয়া নিষিদ্ধ। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের উপর অস্ত্র উত্তোলন করবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। আর যে ব্যক্তি আমাদের ধোঁকা দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়'

(ছহীহ মুসলিম, হা/১০১)। তবে কোম্পানি যদি দৈনিক নাস্তা বা ভাড়া বাবদ একটা এমাউন্ট ফিক্সড করে যার ভাউচার দেখাতে হয় না, তাহলে আপনি নাস্তা না খেয়ে, পায়ে হেঁটে টাকা বাঁচিয়ে নিজের জন্য জমাতে পারেন। কেননা কোম্পানি এটা আপনার জন্য ভাতা হিসেবে নির্ধারণ করেছে। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে কিছু মাল দিলেন। আমি বললাম, আমার চেয়ে অভাবী লোককে দিন। তিনি বললেন, 'তুমি নাও, না চেয়ে এ ধরনের কোনো মাল যদি তোমার কাছে আসে, তাহলে সেটা গ্রহণ করো। আর যে মাল এভাবে আসবে না সেটা গ্রহণ করো না' (ছহীহ বুখারী, হা/১৪০৪; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৪৫)।

প্রশ্ন (২৪): বর্তমানে ক্রিকেট বা ফুটবল খেলা দেখা যাবে কি? যেমন- আইপিএল, বিপিএল, ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ ইত্যাদি।

-মনসুর
পঞ্চগড়।

উত্তর: ক্রিকেট ও ফুটবলসহ বর্তমানে প্রচলিত প্রায় সকল খেলাই জুয়ার অন্তর্ভুক্ত, যা হারাম। তাছাড়া এতে যে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা চলছে তা যেনার শামিল। সুতরাং তা পরিত্যাগ করা আবশ্যক (আল-মায়েদা, ৫/৯০)।

প্রশ্ন (২৫): স্বামী অন্য শহরে চাকরি করেন। মাঝে মাঝে আমি ২ বছরের ছেলেকে নিয়ে স্থানীয় পার্কে যাই। মাহরাম ছাড়া এভাবে বের হওয়া কি জায়েয?

-আয়েশা
সুনামগঞ্জ।

উত্তর: সাময়িক সময়ের জন্য স্থানীয় কোথাও যাওয়া বৈধ হবে, নিম্নোক্ত শর্তগুলো বিদ্যমান থাকলে- ১. ফেতনামুক্ত পরিবেশ হতে হবে। ২. কোনো প্রকার নিরাপত্তার সমস্যা থাকা যাবে না। ৩. নিকটে হতে হবে (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, ১৭/৩৩৬)।

প্রশ্ন (২৬): কোনো অনুষ্ঠানে হাততালি দেওয়া যাবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: হাততালি দেওয়া একটি জাহেলী প্রথা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'কা'বাগৃহে তাদের ছালাত বলতে ছিল শুধু শিস দেওয়া ও হাততালি দেওয়া' (আল-আনফাল, ৮/৩৫)। সুতরাং শুধু ইবাদতের ক্ষেত্রেই নয়; বরং ইবাদতের বাইরেও বিভিন্ন অনুষ্ঠান, খেলাধুলা কিংবা আনন্দদায়ক কোনোকিছু দেখে হাততালি দেওয়া জায়েয নয়। কারণ এতে জাহেলী যুগের মুশরিক ও বর্তমান যুগের অমুসলিমদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করা হয়, যা বর্জন করা আবশ্যক। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত' (মুসনাদে আহমাদ, হা/৫১১৫; আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১; মিশকাত, হা/৪৩৪৭)।

হালাল-হারাম

প্রশ্ন (২৭): আমি অনলাইনে ইসলামী বই বিক্রি করতে চাই। কিন্তু কিছু লেখক বা অনুবাদক সম্পর্কে আলেমরা বিভ্রান্তিমূলক বলে মন্তব্য করেন। অনেক সময় পাঠক চাহিদার ভিত্তিতে এমন বই বিক্রি করতে হয়, যেগুলোর লেখক বা অনুবাদকের মানহাজ সঠিক নাও হতে পারে এবং সব লেখক সম্পর্কে জানা সম্ভবও নয়। তাহলে এমন বই জেনে বা না জেনে বিক্রি করলে কি আমি গুনাহগার হব? এ ক্ষেত্রে আমার করণীয় কী?

-কবির হোসাইন
উত্তরা।

উত্তর: যে সমস্ত লেখকের আক্বীদায় ত্রুটি আছে, তাদের লিখিত বই, শিরক-বিদআতের প্রচার রয়েছে এমন বই, অশালীন প্রেমকাহিনী বা গান-বাজনাসহ ইসলামে হারাম করা হয়েছে এমন বিষয়ে লিখিত বই ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না। কেননা এতে অন্যায়ের সহযোগিতা করা হয়। আর আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা সৎকর্ম ও তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে একে অন্যকে সহযোগিতা করবে। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অন্যের সহযোগিতা করবে না' (আল-মায়েদা, ৫/২)। সুতরাং জেনেশুনে এমন বই বিক্রি করলে বিক্রেতা গুনাহগার হবে। এক্ষেত্রে পাঠকের চাহিদা থাকলেও তাদেরকে এ সমস্ত বইয়ের পরিবর্তে ছহীহ আক্বীদার লেখকদের বই পাঠে পরামর্শ বা উৎসাহ দিতে হবে।

প্রশ্ন (২৮): আমি ওষুধ কোম্পানির মার্কেটিং বিভাগে চাকরি করি। ডাক্তারের কাছে গিফট, টাকা, ভ্রমণের বিনিময়ে ওষুধ লেখার অনুরোধ করি। এটি কি ঘুষ? এইভাবে উপার্জন কি হালাল?

-আহমাদ
ঢাকা।

উত্তর: কোনো কোম্পানির ওষুধ লেখার শর্তে কোম্পানি যদি ডাক্তারকে উপহার কিংবা টাকা দেয়, তাহলে তা সুস্পষ্ট ঘুষ ও প্রতারণা বলে বিবেচিত হবে। সেটা গ্রহণ করা জায়েয হবে না। তা গ্রহণ করলে তিনি প্রতারক। কেননা ডাক্তার যদি সেই কোম্পানির ওষুধ না লিখে, তাহলে তো কোম্পানি তাকে এক পয়সাও দিবে না। এমনকি কোনো প্রকার শর্ত ছাড়াও যদি উপহার দিতে আসে, তাহলে সেটাও গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। তখন বিবেকে না চাইলেও মনের দিক থেকে ডাক্তার উক্ত কোম্পানির প্রতি সহানুভূতি

দেখাবেন। অথচ ডাক্তারের কর্তব্য হলো কোম্পানির ওষুধের গুণগত মান, কার্যকারিতা ও রোগীর অবস্থা বিবেচনা করে প্রেসক্রাইব করা। আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) সূত্রে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘কোনো ব্যক্তি তার কোনো ভাইয়ের জন্য কোনো বিষয়ে সুপারিশ করার কারণে যদি সে তাকে কিছু উপহার দেয় এবং সে তা গ্রহণ করে, তাহলে সে সূদের একটি বড় দরজা দিয়ে প্রবেশ করল’ (আবূ দাঊদ, হা/৩৫৪১)।

জিহাদ

প্রশ্ন (২৯): ইসরাঈলের জুলমের পেছনে আমেরিকার সহায়তা স্পষ্ট। এই জুলমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে মুসলিমদের করণীয় কী? কবে এই জুলমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরয হবে?

–মিনহাজ আহম্মেদ সুজন
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর: ইসরাঈল দীর্ঘদিন ধরে ফিলিস্তীনীদের উপর জমি দখল, ঘরবাড়ি ধ্বংস, শিশু, নারী ও সাধারণ মানুষ হত্যা, পবিত্র মসজিদ আল-আক্বছা অবমাননা ইত্যাদি জুলম করে আসছে। আর বর্তমানে ফিলিস্তীনে আক্রমণ করে ফিলিস্তীনের নাম নিশানা নিশ্চিহ্ন করার পায়তারা করছে। আর বিশ্বমোড়ল আমেরিকা ও তার মিত্র রাষ্ট্রগুলো অস্ত্র, অর্থ ও কূটনৈতিক সমর্থন দিয়ে এই জুলমকে উৎসাহিত করছে। এমন পরিস্থিতিতে মুসলিমদের করণীয় হলো তাদের সাধ্যানুযায়ী বিভিন্নভাবে এ জুলমের প্রতিরোধ করা। নিচে কিছু পয়েন্ট তুলে ধরা হলো- ১. মুসলিম দেশগুলো একত্রিত হয়ে তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করা (আন-নিসা, ৪/৭৫)। ২. আর্থিক সাহায্য করা (আত-তওবা, ৯/৬০)। ৩. দু‘আ করা। মহান আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব’ (আল-মুমিন, ৪০/৬০)। বিশেষ করে রাতের শেষ ভাগে দু‘আ করা (ছহীহ বুখারী, হা/১০৯৪; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৫৮)। ৩. প্রতিবাদ করা (আবূ দাঊদ, হা/৪৩৪৪)। ৪. তাদের পণ্য বর্জন করা (আল-মায়েদা, ৫/২)।

প্রশ্ন (৩০): গাযওয়াতুল হিন্দ সম্পর্কে জানতে চাই। এটি কখন সংঘটিত হবে?

–মেহেদী
হবিগঞ্জ।

উত্তর: গাযওয়াতুল হিন্দ হবে এ কথায় ঠিক। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর গোলাম ছাওবান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘আমার উম্মতের দুটি দল আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জাহান্নাম হতে পবিত্রাণ দান করবেন, একদল যারা হিন্দুস্তানে জিহাদ করবে আর একদল যারা ঈসা ইবনে মারইয়াম (আলাইহিস সালাম)-এর সঙ্গে থাকবে (সুনান নাসাঈ, হা/৩১৭৫)। তবে কখন যুদ্ধ সংঘটিত হবে সে ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। কেউ কেউ বলেছেন, উক্ত যুদ্ধ সংঘঠিত হয়ে গেছে।

সূদ-ঘুষ

প্রশ্ন (৩১): আমার আপনজন বা বন্ধু যদি সূদ বা ঘুষের সাথে জড়িত থাকে, তাহলে আমি কি তাদের দেওয়া কিছু খেতে বা নিতে পারব?

-মুহাম্মাদ ফিরোজ উদ্দীন
মহেশপুর, ঝিনাইদহ।

উত্তর: না, এখান থেকে বিরত থাকাই উত্তম। لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সূদখোর, সূদদাতা, লেখক এবং সাক্ষীদের উপর লা‘নত করেছেন এবং বলেছেন, ‘এরা সবাই গুনাহে সমান’ (ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৯৮)। নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالمُرْتَشِيَ ‘আল্লাহ তাআলা ঘুষদাতা ও গ্রহীতাকে অভিসম্পাত করেছেন’ (আবূ দাঊদ, হা/৩৫৮০)। অপরদিকে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা পবিত্র। তিনি পবিত্র ছাড়া কিছু গ্রহণ করেন না’ (ছহীহ মুসলিম, হা/১০১৫)। তিনি আরো বলেন, ‘ঐ দেহ জান্নাতে যাবে না, যা হারাম দ্বারা লালিতপালিত হয়’ (ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হা/১৭৩০)।

প্রশ্ন (৩২): কোনো ব্যক্তি যদি সূদের মাধ্যমে গাড়ি কিনে এবং অন্য একজন ব্যক্তি তার সঙ্গে গিয়ে সহযোগিতা করে বা ব্যাংকের কাগজপত্রে স্বাক্ষর করে, তাহলে সেই ব্যক্তি কি গুনাহগার হবে?

-আরিফ।

উত্তর: এমন কাজ করা জায়েয নয়। কেননা তাতে অন্যায় কাজে সহযোগিতা করা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তোমরা ভালো কাজে একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করো, মন্দ কাজে করবে না’ (আল-মায়েদা, ৫/২)। لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সূদখোর, সূদদাতা, লেখক এবং সাক্ষীদের উপর লা‘নত করেছেন এবং বলেছেন, ‘এরা সবাই গুনাহে সমান’ (ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৯৮)। এই হাদীছ স্পষ্ট করে দেয় যে, যে ব্যক্তি সূদের চুক্তিতে সাক্ষী হয় বা লেখক হিসেবে কাজ করে বা সহযোগিতা করে, সেও মহান আল্লাহর কাছে গুনাহগার। যদি সে ব্যক্তি জেনেবুঝে ব্যাংকের সূদ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে, তাহলে সে উল্লিখিত হাদীছ অনুযায়ী সরাসরি গুনাহের অংশীদার।

পারিবারিক জীবন

প্রশ্ন (৩৩): আমি একজন প্রবাসী, সঊদী আরব থাকি। আমি আমার স্ত্রীকে মেসেজে তালাক দিয়েছি। তারপর আমার স্ত্রী দেখার আগেই মেসেজ ডিলেট করে দিয়েছি। এখন আমার দেওয়া এই তালাক কি গণ্য হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: ইসলামী শরীআহ অনুযায়ী, তালাক দেওয়ার জন্য স্ত্রীর দেখা, শোনা বা লিখিতভাবে হলে পড়া জরুরী নয়; বরং তালাক প্রদানকারী (স্বামী) উচ্চারণ বা লিখিত ঘোষণা করলেই তালাক সংঘটিত হয়ে যায়, যদি তা সুস্থ অবস্থায় এবং চাপে না পড়ে দেওয়া হয়। সুতরাং এই তালাক কার্যকর হয়ে গেছে, যদিও স্ত্রী মেসেজ না দেখে থাকেন। এমনকি মজার ছলেও কেউ যদি তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাহলে তালাক হয়ে যাবে। নবী ﷺ বলেন, ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعُ 'তিনটি বিষয়ে প্রকৃতপক্ষে বললেও এবং ঠাট্টাচ্ছলে বললেও যথার্থ বলে বিবেচিত হবে। বিয়ে, তালাক ও রাজআত (তালাক প্রত্যাহার)' (তিরমিযী, হা/১১৮৪)। উল্লেখ্য, একসাথে তিন তালাক দিলে এক তালাক হিসেবে গণ্য হবে। এ বিধানই নবী ﷺ-এর যুগে ছিল (ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৭২)।

প্রশ্ন (৩৪): কেউ যদি তার স্ত্রীকে রাগের মাথায় বলে, তুই বাপের বাড়ি গেলে তালাক। আর স্ত্রী যদি তার বাপের বাড়ি চলে যায়। তাহলে তালাক পতিত হবে কি?

-হাকিল আহমেদ
ঢাকা।

উত্তর: স্বামী যদি স্ত্রীকে এভাবে বলে এবং স্ত্রী যদি বাবার বাড়ি চলে যায়, তাহলে এক তালাক পতিত হয়েছে। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعُ 'তিনটি বিষয় এমন আছে যেগুলোর ঠাট্টাকেও বাস্তব বলে গণ্য করা হয়- ১. বিয়ে, ২. তালাক ও রুজূ' (ফিরে নেওয়া) (সুনানে আবী দাঊদ, হা/২১৯৪)।

প্রশ্ন (৩৫): রাগে স্ত্রীকে বলেছি, 'যাহ তুই তালাক', ১ সেকেন্ডের মধ্যে বলি, 'তোরে আমি তালাক দিব'— এতে কি তালাক পতিত হয়েছে?

-নাঈমুর রহমান
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

উত্তর: 'তুই তালাক' বলার সাথে সাথে এক তালাক হয়ে গেছে। কারণ এখানে তালাক শব্দটি স্পষ্ট অর্থবোধক শব্দ। তাই নিয়্যত কী করল আর করল না সেটা ধর্তব্য নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তিনটি বিষয় এমন আছে যেগুলোর মজাকেও বাস্তব বলে গণ্য করা হয়- ১. বিয়ে, ২. তালাক ও রুজূ' (সুনানে আবী দাঊদ, হা/২১৯৪)। পরে বলা, 'আমি তোমাকে তালাক দিব' এ বাক্যের কোনো প্রভাব এখানে নেই। তাই ব্যক্তি যদি আগে কোনোদিন তালাক না দিয়ে থাকে, তাহলে এটাই হবে তার প্রথম তালাক এবং এক তালাকে রেজঈ। অর্থাৎ সে ইচ্ছা করলে তিন মাস অতিক্রম করার পূর্বেই তাকে নতুন করে বিবাহ ছাড়াই ফেরত নিতে পারবে। আর তিন মাস অতিক্রম হলে নতুন করে বিবাহ করে নিতে পারবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তাদের স্বামীরা তাদের ইদ্দতের মধ্যে ফেরত নেওয়ার অধিকার রাখে, যদি তারা মীমাংসা করতে চায়' (আল-বাকারা, ২২/২৮)। তাবেঈ হাসান বাছরী বলেন, فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ এ আয়াত নাযিলের ব্যাপারে মা'কাল ইবনু ইয়াসার বলেন, এটা এ ঘটনার ভিত্তিতে নাযিল হয়, আমার বোনকে কোনো এক লোকের সাথে বিবাহ দেই। সে তাকে তালাক প্রদান করে। তার ইদ্দত শেষ হলে সে তার বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসে। আমি তাকে বলি, আমি আমার বোনকে তোমার সাথে বিবাহ দিয়ে তোমার বিছানাসঙ্গী করি, তোমাকে সম্মানিত করি আর তুমি তাকে তালাক দিলে! আবার বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এসেছ! না, সে তোমার কাছে যাবে না। আর লোকটি দেখতে শুনতে ভালো ছিল আর মেয়েটিও তার কাছে যেতে চাচ্ছিল। তখন আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করেন, 'তোমরা যদি স্ত্রীদের তালাক দাও, অতঃপর তারা তাদের নির্ধারিত সময় পৌঁছে যায়, তখন তাদেরকে স্বামীদের বিবাহ করতে বাধা প্রদান করো না, যদি তারা ন্যায়সঙ্গতভাবে পরস্পর সম্মত থাকে' (আল-বাকারা, ২/২৩২)।

প্রশ্ন (৩৬): আমাদের বিবাহ হয়েছে ২০০৬ সালে। বিবাহের পরে দুই-তিন বছর আমাদের অনেক ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে সংসারে। তখন তালাকের মাসআলাটা আমার জানা ছিল না। তো তখন ভুলে স্ত্রীকে তালাক বলে ফেলছি কি-না এটা আমার মনে পড়ছে না। যদি বলে থাকি সেক্ষেত্রে এখন করণীয় কী?

-মো. রাইহান
ঢাকা।

উত্তর: সন্দেহের উপর ভিত্তি করে শরীআত প্রযোজ্য হয় না। তাই কোনো ব্যক্তি যদি সন্দেহের মাঝে থাকে যে, সে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে কি-না, তাহলে এর মাধ্যমে তালাক পতিত হবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে অভিযোগ করা হলো যে, ছালাত আদায়কালে তার ওযূ ভঙ্গের কিছু হয়েছে বলে মনে হয়, এতে কি সে ছালাত ছেড়ে দেবে? তিনি বলেন, 'না, যতক্ষণ না সে আওয়াজ শুনবে বা দুর্গন্ধ টের পায় অর্থাৎ নিশ্চিত হয়' (ছহীহ বুখারী, হা/১৩৭)।

প্রশ্ন (৩৭): তালাকের সময় ‘বায়েন তালাক’ না বললে কি তালাক হবে না?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: ‘তালাক’ শব্দের সাথে ‘বায়েন’ শব্দ বলা বা না বলার সাথে তালাকের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং তালাকে বায়েন বলতে বুঝায় যে, কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর ৯০দিন অতিক্রম হওয়ার পর স্ত্রী বায়েন হয়ে যায়। এর পূর্বে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলে তা বায়েন হিসেবে গণ্য হয় না। অতএব, কেউ যদি স্ত্রীকে সম্বোধন করে শুধু তালাক শব্দ উচ্চারণ করে তাতেই তালাক হয়ে যাবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তিনটি বিষয়ের চূড়ান্তও চূড়ান্ত আর হাসিতামাশাও চূড়ান্ত- (১) বিবাহ, (২) তালাক ও (৩) প্রত্যাহার’ (ইবনু মাজাহ, হা/২০৩৯)। অত্র হাদীছেও প্রমাণিত হয় যে, বায়েন বলা জরুরী নয়। শুধু তালাক বললেই হয়ে যাবে।

আয়াত ও হাদীছের ব্যাখ্যা

প্রশ্ন (৩৮): আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘যে ব্যক্তি পরিমিত ব্যয় করে সে নিঃস্ব হয় না’। হাদীছটি কী ছহীহ?

-গোলাম রাব্বি
বরিশাল।

উত্তর: উক্ত হাদীছটির সনদ যঈফ। কেননা উক্ত সনদে ইবরাহীম হাজারী নামক এক ব্যক্তি রয়েছে। তিনি যঈফ রাবী (মুসনাদে আহমাদ, হা/৪২৬৯; রিসালা টীকা দ্রষ্টব্য, মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হা/২৭৩০৪)। তবে পরিমিত ব্যয়ে কল্যাণ ও পরিত্রাণ রয়েছে। তিনটি জিনিসে মুক্তি রয়েছে, একটি হলো জীবনযাপনে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা (ছহীহুল জামে, হা/৩০৪৫)।

প্রশ্ন (৩৯): কোনো এক মজলিসে যদি কারো নাম উচ্চারণ করা হয় এবং ঠিক তখনই সে ব্যক্তি উপস্থিত হয়, তখন অনেকে বলেন, ‘আপনি অনেক দিন বাঁচবেন’— এ কথা কতটুকু যুক্তিসম্মত ও শরীআতসম্মত?

-আব্দুল্লাহ
রাজশাহী।

উত্তর: শরীআতে এই ধরনের কথার কোনো ভিত্তি নেই। এমনিভাবে এটা যুক্তিসম্মত কথাও নয়। বরং এটি কুসংস্কার ও হিন্দুয়ানী নীতি।

দু‘আ

প্রশ্ন (৪০): বাচ্চা অনেক কান্না করে। শিশু বাচ্চাকে কুদৃষ্টি থেকে বাঁচানোর জন্য কোনো দু‘আ থাকলে জানাবেন।

-পিয়াস মাহমুদ
জামালপুর।

উত্তর: বদনজর সত্য, বাচ্চাকে মানুষের বদনজর লাগে। সাজগোজ করে বাচ্চাকে বাইরে নিয়ে যাওয়া বা সন্ধ্যার সময় বাড়ির বাইরে, উঠানে বা ছাদে নিয়ে যাওয়া পছন্দনীয় নয়। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘বদনজর সত্য’ (ছহীহ বুখারী, হা/৫৪০৮)। কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য নিম্নোক্ত দু‘আটি বলতে হবে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান এবং হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা-এর জন্য নিম্নোক্ত দু‘আ পড়ে পানাহ চাইতেন আর বলতেন, ‘তোমাদের পিতা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ইসমাঈল ও ইসহাক আলাইহিমাস সালাম-এর জন্য দু‘আ পড়ে পানাহ চাইতেন, أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ ‘আউযুবি বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন কুল্লি শায়ত্বানিও ওয়া হাম্মাহ ওয়া মিন কুল্লি আইনিল লাম্মাহ। অর্থ: আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমার দ্বারা প্রত্যেক শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী এবং প্রত্যেক কুদৃষ্টির অনিষ্ট হতে পানাহ চাচ্ছি’ (ছহীহ বুখারী, হা/৩৩৭১)। আর সন্ধ্যার সময় বাচ্চাকে বাড়ির বাইরে, উঠানে বা ছাদে নিয়ে গেলেও শয়তানের প্রতিক্রিয়া হয়।

প্রশ্ন (৪১): রোগ-বালাই থেকে রক্ষার জন্য কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী আরবী কোন কোন দু‘আ পড়া উত্তম?

-ফিরোজ কবীর
নওগাঁ সদর।

উত্তর: ১. সূরা নাস ও ফালাক পড়ে ফুঁক দিবে। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা নাস ও ফালাক পড়ে হাতে ফুঁক দিয়ে সারা শরীরে মাসাহ করতেন (ছহীহ বুখারী, হা/৫৭৩৫)। ২. এ দু‘আ পড়বে, بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، (ইবনে মাজাহ, হা/৩৮৬৯)। ৩. এই দু‘আটি পড়া যায় সকাল ও সন্ধ্যায় ৩ বার- اَللَّهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ- اَللَّهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ- اَللَّهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আমার শরীরে সুস্থতা দান করুন। হে আল্লাহ! আমার শ্রবণশক্তিতে সুস্থতা দান করুন। হে আল্লাহ! আমার দৃষ্টিশক্তিতে সুস্থতা দান করুন’ (মুসনাদে আবূ দাঊদ, হা/৯০৯)।

প্রশ্ন (৪২): সূরা ইখলাছ দশবার পড়ার ফযীলত কী?

-সাঈদ
নড়াইল।

উত্তর: রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘যে ব্যক্তি দশবার সূরা ইখলাছ পাঠ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করবেন’ (আহমাদ, সিলসিলা ছহীহা, হা/৫৮৯; ছহীহুল জামে‘, হা/৬৪৭২)। এছাড়াও রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘যে ব্যক্তি সূরা ইখলাছকে পছন্দ করবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন’ (তিরমিযী, হা/১৯০১; মিশকাত, হা/২১৩০)। উল্লেখ্য, সূরা ইখলাছ ৫০, ১০০, কিংবা

২০০ বার পাঠ করার ফযীলত সম্পর্কে যে সকল হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তার সবগুলোই যঈফ' (তিরমিযী, হা/২৮৯৮; সিলসিলা যঈফা, হা/৩০০; মিশকাত, হা/২১৫৮-৫৯)।

আশূরায়ে মুহাররম

প্রশ্ন (৪৩): আশূরায়ে মুহাররম গুরুত্বপূর্ণ কেন?

-আব্দুল গনী
কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ।

উত্তর: আশূরায়ে মুহাররমের গুরুত্বের মৌলিক কারণ হলো, এদিনে মহান আল্লাহ মূসা আলাইহিস সালাম ও তার কওমকে অত্যাচারী বাদশাহ ফেরাউনের কবল থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং তাকে ও তার লোকদেরকে ডুবিয়ে মেরেছিলেন। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বর্ণনা করেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আসেন, তখন দেখতে পেলেন ইয়াহূদীরা আশূরা দিবসে ছিয়াম পালন করে। তাদেরকে ছিয়াম পালনের কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, এদিনই আল্লাহ তাআলা মূসা আলাইহিস সালাম ও বনী ইসরাঈলকে ফেরাউনের উপর বিজয় দিয়েছিলেন। তাই আমরা ঐ দিনের সম্মানে ছিয়াম পালন করি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমাদের চেয়ে আমরা মূসা আলাইহিস সালাম-এর বেশি হক্বদার'। এরপর তিনি ছিয়াম পালনের নির্দেশ দিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/৩৯৪৩; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৩০)। দ্বিতীয়ত, নাজাতে মূসার শুকরিয়াস্বরূপ এদিন ও তার পূর্বে একদিন ছিয়াম পালন করলে তা আল্লাহর নিকটে বান্দার বিগত এক বছরের (ছগীরা) গুনাহের কাফফারা হিসেবে গণ্য হয় (ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬২; মিশকাত, হা/২০৪৪)।

প্রশ্ন (৪৪): মুহাররমের ১ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত ছিয়াম পালন করলে ৫০ বছরের নফল ছিয়ামের নেকী লেখা হয়। একথা কি ঠিক?

-আব্দুর রহমান
পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর: উক্ত বক্তব্য মিথ্যাচার ও বানোয়াট। তবে শুধু ৯ ও ১০ তারিখে ছিয়াম পালন করার ফযীলত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ 'আশূরার দিনের ছিয়ামের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আমার প্রত্যাশা, আল্লাহ এর দ্বারা পূর্বের বছরের সব (ছগীরা) গুনাহ মাফ করে দেবেন' (ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬২; মিশকাত, হা/২০৪৪)। উল্লেখ্য, ৫০ বছরের ছওয়াবের হাদীছ জাল (আল-মাওযূআত লি ইবনিল জাওযী, ২/১৯৯)।

প্রশ্ন (৪৫): আশূরা উপলক্ষ্যে মুসলিম উম্মাহর করণীয় কী? মুহাররমের ছিয়াম কোন তারিখে রাখতে হবে?

-মাহমুদ
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তর: আশূরা উপলক্ষে করণীয় হলো ১০ মুহাররম ও তার পূর্বে এক দিনসহ মোট দুই দিন ছিয়াম পালন করা। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! ইয়াহূদী-নাছরারা ১০ মুহাররম আশূরার দিনটিকে সম্মান করে। তখন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আগামী বছর বেঁচে থাকলে ইনশা-আল্লাহ আমরা ৯ মুহাররমসহ ছিয়াম রাখব'। রাবী বলেন, কিন্তু পরের বছর মুহাররম আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়ে যায় (ছহীহ মুসলিম, হা/১১৩৪; মিশকাত, হা/২০৪১)।

প্রশ্ন (৪৬): হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর হত্যার ব্যাপারে দায়ী কে? ইয়াযীদ নাকি সীমার? সঠিক উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-ইবরাহীম
সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

উত্তর: অনেকেই হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর হত্যার ব্যাপারে খলীফা ইয়াযীদকে দায়ী করে থাকেন। কিন্তু খলীফা ইয়াযীদের শাসনামলে ৬১ হিজরীর ১০ মুহাররম ইরাকের কারবালা নামক স্থানে হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে হত্যা করা হলেও তার হত্যার ব্যাপারে ইয়াযীদ দায়ী ছিলেন না। এ মর্মে শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে একমত যে, নিশ্চয় ইয়াযীদ বিন মুয়াবিয়া হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে হত্যার নির্দেশ দেননি। তিনি উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদকে কেবল ইরাক দখল করা হতে বাধা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন (মাজমূউ ফাতাওয়া, ৩/৪১১ পৃ.)। তিনি আরো বলেন, হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর স্ত্রী-পুত্রগণ যখন ইয়াযীদের নিকট পৌঁছলেন, তখন তিনি তাদের অনেক সম্মান করেছেন এবং নিরাপত্তার সাথে তাদেরকে পুনরায় মদীনায় পৌঁছে দিয়েছেন (প্রাগুক্ত)। ইতিহাসগ্রন্থ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর হত্যার ব্যাপারে প্রকৃত দোষী দুইজন- উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ ও সীমার। কারণ কূফাবাসীর বায়আত গ্রহণের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে যখন তিনি সেখানে আগমন করেন এবং তার সাথে বেঈমানী করে তারা তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তখন ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ কূফার গভর্নর ছিল, সে সরাসরি যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল এবং তার আদেশেই এটা ঘটেছে। আর সীমার সরাসরি হত্যাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮/২১৪ পৃ.)। উল্লেখ্য, হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর শাহাদাত বরণের সাথে আশূরায়ে মুহাররমের দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই (ইবনু হাজার আসক্বালানী, দারুল ইছাবা, ১/৩৩১ পৃ.)।

প্রশ্ন (৪৭): ১০ মুহাররম শীআরা যে তাযিয়া মিছিলের আয়োজন করে তাতে অংশগ্রহণ করা যাবে কি? এতে যোগ দেওয়ার পরিণাম কী?

-হারুনুর রশীদ
কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ।

উত্তর: না, তাতে যোগ দেওয়া সম্পূর্ণরূপে হারাম। কেননা তাযিয়া অর্থ বিপদে সান্ত্বনা দেওয়া। অথচ সেটা বর্তমানে শাহাদাতে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর শোকমিছিল হিসেবে রূপ নিয়েছে। তাছাড়া ইসলামে কারো মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক শোক পালন করা নিষেধ। আব্দুল্লাহ ইবনু জা'ফর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জা'ফরের সন্তানদেরকে (জা'ফর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাতের জন্য) শোক প্রকাশের তিনদিন সময় দিলেন। অতঃপর তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে এলেন এবং বললেন, 'আজকের পর হতে তোমরা আর আমার ভাইয়ের জন্য কান্নাকাটি করবে না' (আবূ দাঊদ, হা/৪১৯২; নাসাঈ, হা/৫২২৭; মিশকাত, হা/৪৪৬৩)। কিন্তু বাগদাদের গোঁড়া শীআ আমীর 'মুইযযুদ্দৌলা' ৩৫২ হিজরীর ১০ মুহাররমকে জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা করেন এবং শহর ও গ্রামের সকলকে তাযিয়া মিছিলে যোগদানের নির্দেশ দেন। সেদিন থেকেই এই বিদআতী প্রথা চালু হয়েছে। প্রত্যেক আল্লাহভীরু মুসলিমের এসব বিদআত হতে দূরে থাকা আবশ্যক। কেননা বিদআতীর আমল কবুল হয় না এবং তার পরিণাম জাহান্নাম। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল, যার ব্যাপারে আমাদের কোনো নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮; ছহীহ বুখারী, হা/২৬৯৭)। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, 'তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করা হতে বিরত থাকো। কেননা প্রত্যেক নতুন বিষয়ই বিদআত। আর প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহী' (আহমাদ, হা/১৬৬৯৪; আবূ দাঊদ, হা/৪৬০৭; তিরমিযী, হা/২৬৭৬, ইবনু মাজাহ, হা/৪২, মিশকাত, হা/১৬৫)। নাসাঈর এক বর্ণনায় এসেছে, 'প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম' (নাসাঈ, হা/১৫৭৮)।

বিবিধ

প্রশ্ন (৪৮): অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলে অনেক ফযীলতের কথা হাদীছে বলা হয়েছে। আমরা দেখি যে, ডাক্তারের কাছে রোগী আসে চিকিৎসার জন্য। এক্ষেত্রে ডাক্তার যদি সৎ নিয়্যত রাখে, তাহলে হাদীছে বর্ণিত ফযীলত পাওয়া যাবে কি?

-আব্দুল মালেক বিন ইদ্রিস
চাঁপাই নবাবগঞ্জ সদর।

উত্তর: ডাক্তার যদি সে নিয়্যত রাখে ও রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদ্ধতি অনুসরণ করে, তাহলে সে নেকী পাবে। নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করবে- ১. রোগী এসে বসলে বলবে, لا بأس طهور إن شاء الله। ২. প্রেসক্রিপশন লেখার সময় দু'আ করবে, أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ ৩. সৎ নিয়্যত রাখবে (ছহীহ বুখারী, হা/১)।

প্রশ্ন (৪৯): আমাদের কোম্পানির মালিক অনেক সময় ইচ্ছাকৃতভাবে কর্মচারীদের বেতন দিতে গড়িমসি করে বা দেরি করে। এতে কি তিনি গুনাহগার হবেন না?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: অবশ্যই তারা গুনাহগার ও যালেম। প্রথমত, সে মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশের খেলাফ করেছে। তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মজুরকে তার ঘাম শুকাবার পূর্বেই তোমরা তার মজুরি দিয়ে দাও' (ছহীহুল জামে', হা/১০৫৫)। দ্বিতীয়ত, সে সেই ব্যক্তির খাদ্য আটকে রাখে, যার খাবারের দায়িত্ব তার ঘাড়ে আছে এবং সেই বেতনে আরো অনেক মানুষের খোরপোশ আছে। আর আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যার আহারের দায়িত্বশীল, তাকে তা না দিয়ে আটকে রাখে' (ছহীহ মুসলিম, হা/৯৯৬)। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ধনী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করা জুলম' (ছহীহ বুখারী, হা/২২৭০; ইবনু মাজাহ, হা/২৪০৪)। তৃতীয়ত, বেতন না পেয়ে মনের কষ্টে কর্মচারী বদ-দু'আ করতে পারে। আর সে যদি অত্যাচারিত হয়, তাহলে সে বদ-দু'আ সাথে সাথে মালিককে লেগে যাবে। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তিনটি দু'আ এমন আছে, যার কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই- ১. অত্যাচারিতের দু'আ, ২. মুসাফির ব্যক্তির দু'আ এবং ৩. সন্তানের জন্য তার পিতা-মাতার দু'আ বা বদ-দু'আ' (তিরমিযী, হা/৩৪৪৮; ইবনু মাজাহ, হা/৩৮৬২; সিলসিলা ছহীহা, হা/১৭৯৭)।

প্রশ্ন (৫০): দত্তক নেওয়া সন্তানকে নিজের সন্তান পরিচয় দেওয়া যাবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: পালক সন্তানের ব্যাপারে কুরআনের নির্দেশনা হলো, 'তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃ-পরিচয়ে ডাকো; আল্লাহর কাছে এটাই অধিক ইনছাফপূর্ণ। অতঃপর যদি তোমরা তাদের পিতৃ-পরিচয় না জান, তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই এবং তোমাদের বন্ধু' (আল-আহযাব, ৩৩/৫)। অতএব, যে সন্তানকে লালনপালন করা হবে তাকে তার প্রকৃত বাবা মায়ের দিকেই সম্পৃক্ত করতে হবে, পালনকারীকে বাবা-মা বানানো কোনোভাবেই শরীআতসম্মত নয়।

সম্পাদকীয়-এর বাকী অংশ

ইরান, রাশিয়া ও চীন এ সকল প্রযুক্তি অর্জনে সচেষ্ট এবং কিছু ক্ষেত্রে সফলও। ইরানের বিরুদ্ধে হামলার মূল কারণ ছিল এই অভিযোগ—তারা পারমাণবিক প্রযুক্তি অর্জনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প এক্স প্ল্যাটফর্মে ঘোষণা দেন, আমেরিকা ইরানকে ৬০ দিন সময় দিয়েছিল একটি পারমাণবিক চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য। যারা এই চুক্তির বিরোধিতা করেছিল, তাদের 'সরিয়ে দেওয়া' হয়েছে। যদি ইরান চুক্তিতে না আসে, তাহলে আমেরিকার অস্ত্র ব্যবহার করে ইরানকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হবে। এই আলোচনায় ওমান মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করছিল। তবে ইসরাঈল চাচ্ছিল না যে, ইরানের সঙ্গে কোনো শান্তি আলোচনা হোক।

ইরান, তার সব প্রক্সি যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায়, সম্প্রতি সঊদী আরবের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করছিল। ইসরাঈল এটাও মেনে নিতে পারছিল না। পাশাপাশি, সিরিয়ায় ইরানের পরাজয়, লেবাননে হিজবুল্লাহর দুর্বলতা এবং ইউক্রেনে রাশিয়ার ব্যস্ততায়—ইরান ইতিহাসের এক অত্যন্ত দুর্বল মুহূর্তে রয়েছে। এই সুযোগ ইসরাঈল হাতছাড়া করতে চায়নি। ইরানের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো—তার অভ্যন্তরে এমন অনেক গোষ্ঠী রয়েছে, যারা মোসাদের হয়ে কাজ করে। সেই গোয়েন্দাদের মাধ্যমে ইরানের অভ্যন্তরে ড্রোন পাঠিয়ে সেখান থেকেই হামলা পরিচালিত হয়েছে। এটি মোসাদের ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ গোয়েন্দা হামলা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

যদি ইসরাঈল ইরানকে সফলভাবে পরাস্ত করতে পারে এবং সেখানে একটি পুতুল সরকার বসাতে পারে, তবে পরবর্তী লক্ষ্য হতে পারে তুরস্ক। এভাবেই তারা মুসলিম বিশ্বের কোনো শক্তিশালী দেশকে টিকিয়ে রাখতে চায় না। একসময় 'গ্রেটার ইসরাঈল' প্রতিষ্ঠা করে মসজিদে আক্বছা ধ্বংস করে 'থার্ড টেম্পল' নির্মাণ করবে। আমরা চাইলে এই সংঘাতকে রাজনৈতিক বা ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি একটি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক আধিপত্যের যুদ্ধ।

ইসরাঈল তার ইরানবিরোধী সামরিক অভিযানের নাম দিয়েছে 'রাইজিং লায়ন'। এই নামটি হিব্রু বাইবেলের 'বুক অব নাম্বারস' (২৩:২৪) থেকে নেওয়া, যেখানে বলা হয়েছে— 'দেখো, এই জাতি একটি মহান সিংহের মতো উঠে দাঁড়াবে এবং একটি তরুণ সিংহের মতো নিজেকে উদ্দীপ্ত করবে; সে শিকার না খাওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নেবে না এবং নিহতদের রক্ত না পান করা পর্যন্ত থামবে না'। নেতানিয়াহু এই নাম ঘোষণার আগে মসজিদে আক্বছার 'ওয়েস্টার্ন ওয়াল'-এর একটি ফাটলে একটি চিরকুট রেখে আসেন, যাতে লেখা ছিল— 'জনগণ সিংহের মতো উঠে দাঁড়াবে'। সেই চিত্র সংবাদমাধ্যমে প্রকাশও করা হয়।

ইসরাঈল প্রায়শই তার সামরিক অভিযানের জন্য হিব্রু বাইবেল থেকে অনুপ্রেরণা নেয়। যেমন- 'অ্যারো অব বাশান', 'আমালেক'-এর কাহিনি কিংবা 'বুক অব ডিউটেরনমি'-এর উদ্ধৃতি। ২০২৩ সালের ২৮ অক্টোবর এক বিবৃতিতে নেতানিয়াহু বাইবেলের 'বুক অব ডিউটেরনমি' (২৫:১৭) থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'আমালেক তোমার সঙ্গে যা করেছিল তা মনে রেখো, আমরা মনে রাখি এবং আমরা যুদ্ধ করি'। এই কাহিনির মাধ্যমে নেতানিয়াহু একটি সম্পূর্ণ জনগোষ্ঠী নিশ্চিহ্ন করার ইঙ্গিত দেন। এমনকি ইসরাঈলের অস্ত্র ও প্রযুক্তির নামকরণও ধর্মীয় অনুষঙ্গ থেকে নেওয়া— যেমন: 'ল্যাভেন্ডার', 'দ্য গসপেল', 'জেরিকো মিসাইল', 'ডেভিড'স স্লিং'।

দুঃখজনক হলেও সত্য, যখন ইসরাঈলের ইয়াহূদীরা এবং ভারতের হিন্দুরা কট্টর ধর্মীয় চেতনায় বলীয়ান, তখন মুসলিমরা প্রতিযোগিতা করছে কে কত বড় সেক্যুলার হতে পারে তা প্রমাণ করতে। দীর্ঘ ২০০ বছরের ঔপনিবেশিক গোলামি মুসলিমদের আত্মমর্যাদা, চেতনা ও দ্বীনী চরিত্রকে এমনভাবে বিনষ্ট করেছে যে, তারা দুনিয়ার মোহে নিজেদের সবকিছু বিকিয়ে দিতে দ্বিধা করে না।

হ্যাঁ, মুসলিমরা সামরিক শক্তিতে আমেরিকা ও ইসরাঈলের তুলনায় দুর্বল; কিন্তু আল্লাহর শক্তি সবার ওপরে। আদ জাতির ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ বলেন, ﴿فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ 'আর আদ জাতি পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করেছিল এবং বলেছিল, "আমাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী আর কে আছে?" তারা কি জানে না, যে আল্লাহ তাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের চেয়েও অধিক শক্তিধর?' *(ফুছছিলাত, ৪১/১৫)*।

ফেরাউন যেভাবে মহান আল্লাহর অলৌকিক শক্তির সামনে পরাজিত হয়েছিল, আজকের যুগের ফেরাউনরাও আল্লাহর শক্তির সামনেই পরাজিত হবে। তবে তার পূর্বে মূসা আলাইহিস সালাম-এর মতো ঈমান, আল্লাহর প্রতি অগাধ আস্থা ও ইখলাছের সাথে নিরন্তর চেষ্টা লাগবে। মুসলিমরা যেদিন তাদের সর্বোচ্চটা করবে, সেদিন আসমান থেকে আল্লাহর অলৌকিক শক্তি নেমে আসবে। সেই অলৌকিক শক্তিতেই এই ফেরাউনদের ধ্বংস হবে ইনশা-আল্লাহ। মুসলিমদের জরুরী ভিত্তিতে কলোনিয়াল মাইন্ডসেট থেকে বের হয়ে আসতে হবে। নিজ দ্বীন নিয়ে হীনম্মন্যতা থেকে বেরিয়ে আত্মমর্যাদা, আত্মসম্মান ব্যক্তিত্ব গঠনে মনোযোগী হতে হবে, যাতে তাদের মধ্যে দুর্নীতি, মিথ্যা ও প্রতারণার মতো গোলামির স্বভাবগুলো না থাকে। এরপর জ্ঞানের জগতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে, সর্বোচ্চ প্রোডাক্টিভ হতে হবে। আল্লাহর পতাকাকে উচ্চ করার জন্য দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করতে হবে। সর্বোচ্চ ত্যাগ ও সর্বোচ্চ চেষ্টা যেদিন একত্রিত হবে, ইনশা-আল্লাহ বিজয় আসবেই। *(প্র. স.)*

মাকতাবাতুস সালাফ
কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত

পৃষ্ঠা ৫০৮
মূল্য ৬০০ টাকা

পৃষ্ঠা ১৪৪
মূল্য ১৩০ টাকা

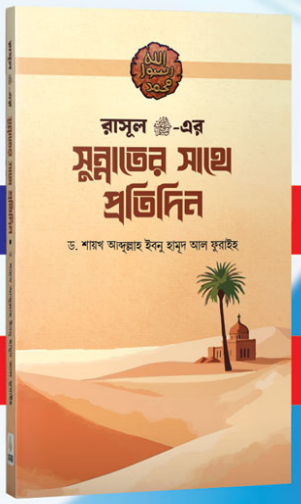

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী। ০১৪০৭-০২১৮৪৭ MaktabatusSalaf

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত
প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর সমূহ

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৭০১
নগদ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য

নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৬০০
নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)
বিকাশ নং- ০১৯০৪-১২২৫৪৬ (এজেন্ট)

আদ দাওয়াহ ইলাল্লহ মক্তব কার্যক্রমের জন্য

মক্তব ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং-২০৫০ ৭৭৭০ ১০০৬ ৫৮৪২৩
নগদ নং- ০১৯৫৮-১৫৩৭২০ (মার্চেন্ট)

যাকাতের জন্য

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৪১৭
বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)

মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য

নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৯০৩
বিকাশ, নগদ ও রকেট নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাল)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য

বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৩১৬
বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন | আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

আধুনিককালের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ
আল্লামা মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ
বিষয়ভিত্তিক ছহীহ হাদীছসমগ্র

মাকতাবাতুস সালাফ

সিলসিলা ছহীহা
মূল : আল্লামা মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ
১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড

১ম খণ্ড	৫১২ পৃষ্ঠা	৫০০ টাকা
২য় খণ্ড	৫৭২ পৃষ্ঠা	৫৮০ টাকা
৩য় খণ্ড	৫০৪ পৃষ্ঠা	৬২০ টাকা

১৬০ টাকা | ৬৫০ টাকা | ৯০ টাকা | ১০০ টাকা | ৯০ টাকা

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী। ০১৪০৭-০২১৮৪৭ MaktabatusSalaf

তুবা পাবলিকেশন কর্তৃক প্রকাশিত

হজ্জ ও উমরা
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
পৃষ্ঠা : ১২৮ মূল্য : ৯০ টাকা

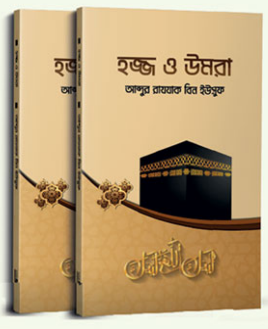

এছাড়াও তুবা পাবলিকেশনের অন্যান্য বই পেতে ভিজিট করুন tubapublication.com

রাজশাহী
নওদাপাড়া (আমচত্বর), সপুরা, রাজশাহী
মোবাইল : ০১৩০১-৩৯৬৮৩৬

বাংলাবাজার
গিয়াস গার্ডেন মার্কেট, নর্থব্রুক হল রোড, ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৪০৭-০২১৮৫০